ইস্কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

মায়ার অজ্ঞান অন্ধকার পরাভূত করার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হচ্ছে আমাদের গ্রন্থ এবং ম্যাগাজিন, আর আমরা এই সমস্ত গ্রন্থাবলী সারা পৃথিবী জুড়ে যত বেশি প্রকাশ করব এবং বিতরণ করব ততই আমরা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। তোমাদের গ্রন্থ বিতরণের বিবরণ দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, কেন না তাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে অধিক থেকে অধিকতর মানুষ যাতে আমাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়াকে তোমরা তোমাদের দায়িত্ব বলে মনে করছ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রচারকার্যের এটিই হচ্ছে সুদৃঢ় ভিত্তি– অন্য কোন আন্দোলনে প্রচারের এরকম প্রামাণিকতা নেই। আর কেউ যদি আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন পাঠ করে, তা হলে সে পূর্ণরূপে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাই সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে যখই সম্ভব, গ্রন্থ বিতরণ অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। কেউ যদি আমাদের দর্শন সম্বন্ধে শোনে, তাহলে তাকে সাহায্য করবে ঠিকই কিন্তু সে যদি একটি গ্রন্থও কেনে তাহলে তার সমস্ত জীবন পরিবর্তন হতে পারে। তাই গ্রন্থ প্রচারই হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রচার।
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দ্বাদশ বর্ষ ▶ চতুর্থ সংখ্যা ▶ অক্টোবর ▶ নভেম্বর ▶ ডিসেম্বর ২০০৭ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস ব্রহ্মচারী

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত
প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (তারতে)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস

স্বত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ

ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা
রেজিঃ ডাকে – ১১০.০০টাকা

গ্রাফিক ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

❋ যোগাযোগ করুন ❋

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৯১৭৫১৮৮২৭

❀ সূচীপত্র ❀

❊ প্রচ্ছদপট ❊

ইন্দ্রনীলমণির মতো অতি মনোহর যাঁর বর্ণ, বিকশিত কদম্ব-কুসুম দ্বারা যাঁর কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁর বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাচ্ছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক।

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমল-নয়ন! হে গোপীকান্ত! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি অনেক স্বরূপে হে নাথ! তুমি জীবের ভববন্ধ-মোচনের জন্য প্রকটিত থেকে অপার করুণা প্রদর্শন করছ; অতএব হে নাথ! তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হোক।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দঃ ৫২১; বঙ্গাব্দঃ ১৪১৪; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৭

তারিখ		বিবরণ
১০ই পদ্মনাভ, ১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর ২০০৭, শনিবার	ঃ	**ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।**
১১ই পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর ২০০৭, রবিবার	ঃ	*একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৫২ মিঃ থেকে ০৯.৪৮ মিঃ মধ্যে*
২২শে পদ্মনাভ, ৩১শে আশ্বিন, ১৮ই অক্টোবর ২০০৭ বৃহস্পতিবার	ঃ	**শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা।**
২৫শে পদ্মনাভ, ৩রা কার্তিক, ২১শে অক্টোবর ২০০৭, রবিবার	ঃ	*শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীপাদ মাধবাচার্যের আবির্ভাব।*
২৬শে পদ্মনাভ, ৪ঠা কার্তিক, ২২শে অক্টোবর ২০০৭, সোমবার	ঃ	**পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস**
২৭শে পদ্মনাভ, ৫ই কার্তিক, ২৩শে অক্টোবর ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	*একাদশী পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৫৯ মিঃ থেকে ০৯.৪৮ মিঃ মধ্যে* *শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব।* *শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।* *শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।*
৩০শে পদ্মনাভ, ৮ই কার্তিক, ২৬শে অক্টোবর ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	**শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা।** *চাতুর্মাস্যের ৪র্থ মাস শুরু, (একমাস মাষকলাই বর্জন),* *শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব।*
৪ঠা দামোদর, ১২ই কার্তিক, ৩০শে অক্টোবর ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	*শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব।*
৮ই দামোদর ,১৬ই কার্তিক, ৩রা নভেম্বর ২০০৭, শনিবার	ঃ	*শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব।*
১০ই দামোদর, ১৮ই কার্তিক, ৫ই নভেম্বর ২০০৭, সোমবার	ঃ	**রমা একাদশীর উপবাস।**
১১ই দামোদর, ১৯শে কার্তিক, ৬ই নভেম্বর ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	*একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.০৭ মিঃ থেকে ০৯.৫০ মিঃ মধ্যে*
১৪ই দামোদর ২২শে কার্তিক, ৯ই নভেম্বর ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	*দীপাবলী, দীপদান। কালীপূজা।*
১৬ই দামোদর, ২৪শে কার্তিক, ১১ই নভেম্বর ২০০৭, রবিবার	ঃ	*শ্রীশ্রী গোবর্ধন পূজা, গোপূজা, গো-ক্রীড়া,*
১৭ই দামোদর, ২৫শে কার্তিক, ১২ই নভেম্বর ২০০৭, সোমবার	ঃ	*শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।*
১৯শে দামোদর, ২৭শে কার্তিক, ১৪ই নভেম্বর ২০০৭, বুধবার	ঃ	**শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব।** **(দুপুর পর্যন্ত উপবাস)**
২৩শে দামোদর, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর ২০০৭, রবিবার	ঃ	*শ্রী গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী,* *শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর তিরোভাব।*
২৪শে দামোদর, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর ২০০৭, সোমবার	ঃ	*শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা।*
২৬শে দামোদর, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর ২০০৭, বুধবার	ঃ	**উত্থান একাদশীর উপবাস।** **শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।** *শ্রী ভীষ্মপঞ্চক শুরু (৫ দিন)।*
২৭শে দামোদর, ৫ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	*একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.১৭ মিঃ থেকে ০৭.৪২ মিঃ মধ্যে*
২৮শে দামোদর, ৬ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নভেম্বর ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	*শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী এবং শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।*
২৯শে দামোদর, ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর ২০০৭, শনিবার	ঃ	*শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। তুলসী-শালগ্রাম বিবাহ।* *শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব। চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপ্ত।*
১লা কেশব, ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নভেম্বর ২০০৭, রবিবার	ঃ	*কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ।*
১১ই কেশব, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর ২০০৭, বুধবার	ঃ	**উৎপন্না একাদশীর উপবাস।** *শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।*
১২ই কেশব, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	*একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.২৭ থেকে ১০.০২ মিঃ মধ্যে* *শ্রীল কালীয়কৃষ্ণদাসের তিরোভাব।*
১৩ই কেশব, ২০শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	*শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।*
২১শে কেশব, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর ২০০৭, শনিবার	ঃ	*শ্রী ওড়ন ষষ্ঠী*
২৬শে কেশব, ৪ঠা পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	**মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।** *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জয়ন্তী উৎসব।*
২৭শে কেশব, ৫ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	*একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৬.৩৬ মিঃ থেকে ১০.০৯ মিঃ মধ্যে*
১লা নারায়ণ, ৮ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর ২০০৭, সোমবার	ঃ	*কাত্যায়নী ব্রত সমাপ্ত।*
৪ঠা নারায়ণ, ১১ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	**শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব।** *(দুপুর পর্যন্ত উপবাস)*
৯ই নারায়ণ, ১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী ২০০৮, মঙ্গলবার	ঃ	**শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজের আবির্ভাব।**

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা জন্মাষ্টমী

-শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আসুরিক রাজাদের অবাঞ্ছিত সামরিক শক্তির প্রভাবে একসময় পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় সমগ্র পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তখন মাতা বসুন্ধরা ব্যথিত চিত্তে ব্রহ্মার কাছে তাঁর দুঃখের কথা নিবেদন করতে গেলেন । একটি গাভীর রূপ ধারণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতা বসুন্ধরা ব্রহ্মার কাছে করুণভাবে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। তাঁর কথা শুনে ব্রহ্মাও অত্যন্ত ব্যথিত হলেন অচিরেই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আলয় ক্ষীরসমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের নেতৃত্বে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার অনুগামী হলেন। মাতা বসুন্ধরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন। ক্ষীরসমুদ্রের তীরে পৌছে ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর বন্দনা করতে শুরু করলেন, যিনি বরাহ-রূপ ধারণ করে পূর্বে বসুন্ধরাকে রক্ষা করেছিলেন। দেবতারা 'পুরুষ-সুক্ত' স্তব করা সত্ত্বেও যখন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হলেন না, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তপস্যা করতে শুরু করলেন। সেই সময় ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মার কাছে তাঁর বার্তা প্রেরণ করলেন। ভগবান ব্রহ্মাকে জানালেন যে, তিনি অচিরেই তাঁর পরাশক্তিসহ অসুর সংহার করার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং তখন দেবতারাও যেন তাঁর সহায়তা করার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাঁরা যেন অচিরেই যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন যে কুলে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হবেন।

ব্রহ্মা তখন দেবতাদের সেই বার্তা শোনালেন। বৈদিক জ্ঞানলাভের এটাই হচ্ছে পন্থা। ব্রহ্মা তাঁর হৃদয়ে সর্বপ্রথম ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ প্রাপ্ত হন। সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, "তেনে ব্রহ্মহৃদা।" অর্থাৎ ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান সর্বপ্রথম ব্রহ্মজ্ঞান দান করেছিলেন। এখানেও ঠিক সেইভাবেই ব্রহ্মা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে বার্তা পেলেন এবং সেই বার্তা তিনি অবিলম্বে অন্য দেবতাদের শোনালেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর অবতরণের পূর্বেই সমস্ত দেবতারা তাঁদের পত্নীসহ ভগবানের কার্যে সহায়তা করবার জন্য যদুকূলে বিভিন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে "তৎ প্রিয়ার্থং" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার তাৎপর্য হচ্ছে যে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবতারা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যিনি কার্য করেন, তিনিই হচ্ছেন দেবতা।

এক সময় সুরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে রথেচড়ে তাঁর প্রাসাদে ফিরছিলেন। সেই সময় উগ্রসেনের পুত্র
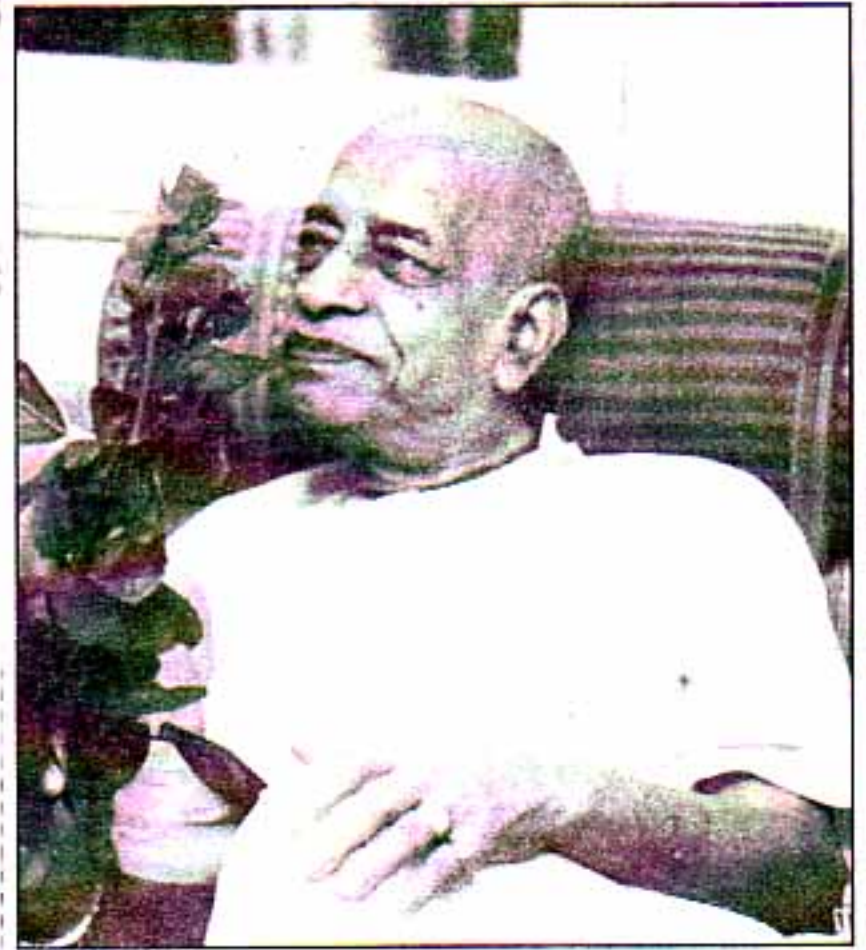
কংস তাঁর ভগ্নী দেবকীকে প্রসন্ন করার মানসে বসুদেবের রথের সারথি হয়ে সেই রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে কন্যার বিবাহের পর তার ভাই তাকে শ্বশুরালয়ে পৌছে দিয়ে আসে, যাতে ভগ্নী নিঃসঙ্গ বোধ না করে। দেবকীর পিতা দেবক তাঁর অতি আদরের কন্যার বিবাহে অতুল ঐশ্বর্য দান করছিলেন। তিনি সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত চারশ' হাতি, পনের হাজার সুসজ্জিত অশ্ব এবং আঠারশ রথ দান করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে দু'শ সুন্দরী দাসীও দান করেছিলেন। এখনও ভারতের ক্ষত্রিয় বংশে এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। নববিবাহিত বধুর সঙ্গে তার সখীরাও তাঁর শ্বশুরালয়ে গমন করেন। তাদেরকে দাসী বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছেন রাজকন্যার সহচরী। এই প্রথা পুরাকাল থেকে প্রচলিত আছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের আগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বসুদেব তাঁর পত্নীর সংগে তাঁর সহচরী দু'শ সুন্দরী কন্যাও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বরবধু যখন রথে করে যাচ্ছিলেন, তখন সেই শুভলগ্ন ঘোষণা করে নানারকম বাদ্য বাজছিল। শঙ্খ, বেনু, মৃদঙ্গ এবং ভেরীর শব্দে এক অপূর্ব শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছিল। সমস্ত শোভাযাত্রা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, আর কংস বরবধুর রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎ দৈববাণী হল, "কংস, তুমি অতি নির্বোধ। মুর্খতার বশে তুমি তোমার বোন এবং ভগ্নীপতির রথ চালিয়ে নিয়ে যাচছ। তুমি জাননা যে এই ভগ্নীর অষ্টম গর্ভের সন্তান

তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। "
ভোজবংশীয় রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস ছিল অত্যন্ত আসুরিক ভাবাপন্ন। এই আকাশবাণী শোনা মাত্র কংস এক হাতে তার ভগ্নী দেবকীর কেশাকর্ষণ করে তার অসি কোষমুক্ত করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল। কংসের এই দুর্ব্যবহারে বসুদেব অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং তাঁর নির্দয় এবং নির্লজ্জ শ্যালককে শান্ত করার জন্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে তাকে বলতে লাগলেন, "হে প্রিয় কংস! তুমি হচ্ছ ভোজবংশের সবচাইতে যশস্বী রাজা, লোকে তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং মহাতেজস্বী রাজা বলে জানে। সেই তুমি কিভাবে এত ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার সদ্যবিবাহিতা ভগ্নীকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছ? তুমি কেন এভাবে মৃত্যুভয়ে ভীত হচ্ছ? মৃত্যুতো অবশ্যম্ভাবী। তোমার জন্মের সংগে সংগে তোমার মৃত্যুরও জন্ম হয়েছে। যে দিন তোমার জন্ম হয়েছে, সেই দিন থেকেই তোমার মৃত্যু হতে শুরু হয়েছে। তোমার বয়স যদি এখন পঁচিশ বছর হয়, তার অর্থ হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই তোমার পঁচিশ বছরের মৃত্যু হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষণে, তোমার মৃত্যু হচ্ছে। তাহলে মৃত্যুতে তোমার এত ভয় কেন? মৃত্যুতো অবশ্যম্ভাবী। তোমার মৃত্যু আজই হতে পারে অথবা একশ বছর পরেও হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে তুমি কোনদিনও নিস্তার পাবে না। তাহলে তুমি মৃত্যুকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে বর্তমান শরীরের বিনাশ। যেই মুহূর্তে শরীরের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায় এবং তা প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের সঙ্গে মিশে যায়, জীবাত্মা তখন অন্য একটি শরীর ধারণ করে। এই অন্য দেহ ধারণ কর্ম অনুসারে হয়ে থাকে। পায়ে চলার সময় মানুষ যেমন তার একটি পা সুদৃঢ়ভাবে মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, অন্য পাটি উঠিয়ে পদক্ষেপ করে, তেমনই ক্রমশঃ দেহের পরিবর্তন হয় এবং আত্মা দেহান্তরিত হয়। দেখ কিভাবে সাবধানতার সঙ্গে শুঁয়োপোকা এক শাখা থেকে অন্য শাখায় যায়। ঠিক তেমনই জীবাত্মা উচ্চ অধিকারীদের নির্ণয় অনুসারে তার দেহ পরিবর্তন করে। জীবাত্মা যতক্ষণ এই ভৌতিক শরীরে আবদ্ধ থাকে, তাকে একের পর এক ভৌতিক শরীর গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক জীবাত্মা এই জন্মের কর্ম অনুসারে তার পরবর্তী জন্মগ্রহণ করে।

কিভাবে তাঁর পত্নীর প্রাণরক্ষা করবেন সে সম্বন্ধে বিবেচনা করে বসুদেব অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কংসকে সম্বোধন করতে লাগলেন, যদিও কংস ছিল সবচাইতে পাপিষ্ঠ। কখনও কখনও বসুদেবের মত ধর্মপরায়ণ মানুষকে কংসের মত কদর্য প্রকৃতির মানুষের চাটুকারিতা করতে হয়, এটাই হচ্ছে কূটনীতির পন্থা। অন্তরে ভারাক্রান্ত হলেও, বাইরে তিনি প্রসন্নতার ভাব প্রদর্শন করলেন। অতি নির্দয় এবং নির্লজ্জ কংসকে সম্বোধন করে তাই বসুদেব বললেন, " প্রিয় কংস, তুমি বিবেচনা করে দেখ, তোমার ভগ্নীর থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা করার কারণ নেই। তুমি আকাশবাণী শুনে বিপদের আশঙ্কা করছ কিন্তু সে বিপদ আসবে তোমার ভগ্নীর থেকে, যার এখনও জন্ম হয়নি। কে জানে, হয়ত ভবিষ্যতে তার কোনও সন্তানই হবে না। এই সমস্ত বিচেবচনা করে দেখ, তাহলে দেখবে যে তুমি এখন নিরাপদ। আর তোমার ভগ্নীর কাছ থেকে বিপদ আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তাঁর যদি কোন পুত্রসন্তান হয়, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাদেরকে তোমার হাতে অর্পণ করব।

কংস বসুদেবের প্রতিজ্ঞার মূল্য জানত, তাই তাঁর এই প্রতিশ্রুতিতে সে সম্মত হল। তখনকার মত সে ভগ্নীহত্যার মত জঘণ্য কার্য থেকে বিরত হল। বসুদেব স্বস্তি বোধ করলেন এবং কংসের এই বিবেচনার প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

কিছুদিন পরে বসুদেব এবং দেবকীর একে একে আটটি পুত্রসন্তান হল এবং একটি কন্যা হল। প্রথম পুত্রের জন্মের পর, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বসুদেব তাকে কংসের কাছে নিয়ে গেলেন। বসুদেবের চরিত্র ছিল অত্যন্ত মহান এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং চরম বিপদেও তিনি সত্যভ্রষ্ট হননি। নবজাত শিশুটিকে কংসের হাতে অর্পণ করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক ছিল কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তিনি কংসের হাতে তাঁর নবজাত সন্তানটিকে অর্পণ করলেন। সেই শিশুটিকে পেয়ে কংস অত্যন্ত প্রসন্ন হল। কিন্তু বসুদেবের এই আচরণে কংসের হৃদয়ে বসুদেবের প্রতি একটু করুণার উদয় হল। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দর একটা শিক্ষা পাই। বসুদেবের মত মহাত্মার পক্ষে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করা একটুও কঠিন নয়। বসুদেবের মত বিদ্বান কাউকে কোন অপবাদ না দিয়েই তাদের কার্য করে যান আর কংসের মত জঘণ্য প্রকৃতির মানুষ যে কোনও পাপকাজ করতে পারে। কিন্তু ভগবানের ভক্ত পরমেশ্বরের ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে পারেন।

বসুদেবের ব্যবহারে কংস অত্যন্ত প্রসন্ন হল এবং তাঁর এই আচরণে দ্রবীভূত হয়ে বলতে লাগল, "প্রিয় বসুদেব, তোমার এই পুত্রকে নিয়ে আমার কোন লাভ নেই, কেননা দৈববাণীতে আমি শুনেছি যে তোমার অষ্টম পুত্র আমাকে সংহার করবে- সুতরাং অনর্থক কেন আমি তোমার এই পুত্রটি প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করব ? তুমি একে নিয়ে যেতে পার।

বসুদেব তখন তাঁর প্রথম সন্তানকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কংসের আচরণে যদিও তাঁর হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কেননা তিনি জাতেন যে কংসের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ অসংযত। তিনি জানতেন যে নাস্তিকেরা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে না। যে তার ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে তার কথার দামও রাখতে পারেন না।

সেই সময় নারদ মুনি কংসের কাছে এলেন- তিনি জানতেন যে কংস দয়াপরবশ হয়ে বসুদেবের প্রথম সন্তানটিকে বসুদেবের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাতে

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবতরণ করেন সেই আয়োজন করতে নারদ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি কংসকে বললেন যে, নন্দ মহারাজ সহ বৃন্দাবনের সমস্ত গোপকুমার এবং গোপকুমারীরা এবং বসুদেব এবং তার পিতা সুরসেন সহ সমস্ত যদুবংশীয় এবং বৃষ্ণি বংশীয় মহাত্মারা ভগবানের অবতরণের অপেক্ষা করছেন। নারদ কংসকে সাবধান করে দিলেন সেই সমস্ত পরিবারের সমস্ত বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং দেবতাদের থেকে সাবধান থাকতে। কংস এবং তাঁর বন্ধু এবং পরামর্শদাতারা সকলেই ছিল আসুরিক। দানবেরা সর্বদাই দেবতাদের ভয়ে ভীত থাকে। এইভাবে নারদের কাছে বিভিন্ন পরিবারের দেবতাদের জন্মগ্রহণ করার কথা শুনে কংস তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, সে বুঝতে পারল যে দেবতারা যেহেতু আবির্ভূত হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই অচিরেই আবির্ভূত হবেন। সে তৎক্ষণাৎ তার ভগ্নিপতি বসুদেব এবং দেবকীকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করল এবং তাদের নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করল।

কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, বসুদেব এবং দেবকী প্রতিবছর একটি করে পুত্রের জন্ম দিতে লাগলেন, আর কংস তাদের বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে একে একে হত্যা করতে লাগল। দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তানের প্রতি কংস বিশেষভাবে ভীত ছিল, কিন্তু নারদের আগমনের পর, সে বিবেচনা করল, যে কোনও সন্তানই কৃষ্ণ হতে পারে। তাই দেবকী এবং বসুদেবের সবকটি সন্তানকেই হত্যা করা শ্রেয় বলে সে মনে করল।

বসুদেব যখন ভগবানের স্বরূপকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন তখন তাঁকে সহস্র সূর্যের মত উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিল। বসুদেবের নির্মল হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রকাশ হয়, বিশেষ করে, সেই হৃদয়কে ধাম বলা হয়। ধামে কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপেরই প্রকাশ হয় না, সেখানে তাঁর নাম, তাঁর রূপ, তাঁর গুণ, তাঁর পরিকর ও বৈশিষ্ট্য সবই একসঙ্গে প্রকাশিত হয়।

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ তাঁর সমস্ত শক্তি সহ বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হল ঠিক যেভাবে অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান চন্দ্রে প্রবেশ করে।

বসুদেবের শরীর থেকে কৃষ্ণ দেবকীর শরীরে প্রবেশ করলেন, যদিও তিনি সাধারণ জীবাত্মার সীমার অতীত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ, আদি অন্য সমস্ত পূর্ণ অবতারেও থাকেন এবং তাঁরা কোন অবস্থাতেই এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ নন। এইভাবে দেবকী অদ্বয়তত্ত্ব, সমস্ত বিশ্বচরাচরের পরম কারণ, পরমেশ্বর ভগবানের আবাসে পরিণত হলেন। এইভাবে দেবকী পরম সত্যের আবাস হয়ে উঠলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে হল। অগ্নি যখন কোন পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে তখন
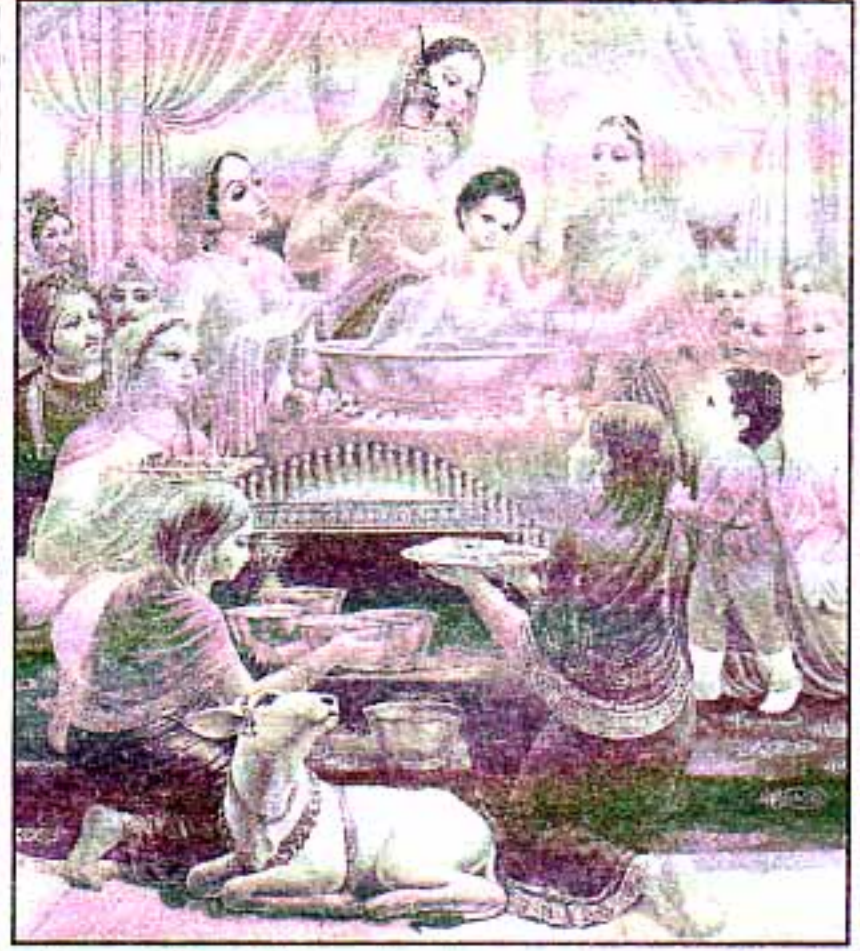
তার জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় না। তেমনই যখন জ্ঞানের অপব্যবহার হয়, যখন জ্ঞানের দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল সাধন হয় না, সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ নিরর্থক। পরমেশ্বর ভগবানকে গর্ভে ধারণ করার ফলে দেবকী যে অপূর্ব সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কংসের প্রাসাদে কারারুদ্ধ থাকার ফলে কেউই তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে পারল না।

কংসই কেবল তার ভগিনী দেবকীর দিব্য রূপ দর্শন করল, এবং তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পূর্বে দেবকীকে কখনও এত সুন্দর দেখায়নি। সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল যে, তাঁর গর্ভে সুন্দরতম কিছু বিরাজ করছে। এই ভেবে কংস অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। সে নিশ্চিতভাবে জানতো যে, পরমেশ্বর ভগবান ভবিষ্যতে তাকে হত্যা করবে এবং এখন সে বুঝতে পারল যে তিনি এসে গেছেন।

যখন ভগবানের আবির্ভাবের সময় হল তখন, কাল সর্বগুণ সমন্বিত হয়ে পরম সুন্দর হয়ে উঠল। তখন পৃথিবী আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিথি, যোগ এবং নক্ষত্র তখন সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বসুলক্ষণ যুক্ত হয়ে উঠল। সর্বসুলক্ষণ যুক্তা রোহিণী নক্ষত্র তখন তুঙ্গে প্রকাশিত হল। ব্রহ্মা স্বয়ং এই রোহিণী নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে নক্ষত্রের অবস্থান ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান এবং প্রভাবের ফলে শুভ এবং অশুভ তিথি ও যোগ বিচার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় সমস্ত গ্রহগুলি সবরকম মঙ্গলময় অবস্থা এবং সবরকম শুভ ইঙ্গিত প্রদর্শন করে বিরাজ করতে লাগল।

তখন ভগবান বিষ্ণু, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, রাত্রির গভীর অন্ধকারে পরমেশ্বর ভগবানরূপে দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। পূর্ণচন্দ্র যেভাবে পূর্বদিগন্তে উদিত

হয়, ঠিক তেমনভাবেই পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হলেন। বসুদেব দেখলেন যে, সেই অদ্ভুত শিশুটি চতুর্ভুজ। তিনি তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে আছেন। বক্ষে তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে তাঁর কৌস্তভ শোভিত কণ্ঠহার, পরণে তাঁর পীতবসন, উজ্জ্বল মেঘের মত তাঁর গায়ের রঙ, বৈদুর্য মণিভূষিত কিরীটি তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছে নানারকম মহামূল্য মণি-রত্ন শোভিত সমস্ত অলঙ্কার তাঁর দিব্য দেহে শোভা পাচ্ছে, তাঁর মাথা ভর্তি কুঞ্চিত কালো কেশরাশি। এই অদ্ভুত শিশুটিকে দেখে বসুদেব অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি ভাবলেন, কিভাবে একটি নবজাত শিশু এরকম সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হল? তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তখন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বসুদেব তখন ভাবতে লাগলেন, যদিও তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ একজন সাধারণ মানুষ এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে কংসের কারাগারে আবদ্ধ, তবুও পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তাঁর স্বরূপ ধারণ করে তাঁর সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কোনও মনুষ্যশিশু এইভাবে চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে অলঙ্কার এবং সবরকম দিব্য সাজে সজ্জিত হয়ে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত লক্ষণগুলি যুক্ত হয়ে এভাবে জন্মগ্রহণ করে না। বসুদেব বারবার সেই শিশু সন্তানটির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন, কিভাবে তাঁর এই পরম সৌভাগ্যের মুহূর্তটি তিনি উদ্‌যাপন করবেন। তিনি ভাবলেন, সাধারণতঃ যখন পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, মানুষ তখন মহোৎসব করে, আর পরমেশ্বর ভগবান আজ আমার গৃহে আমার সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কত মহা আড়ম্বরে আমার এই উৎসব পালন করা উচিত। কিন্তু কংসের কারাগারে আমি বন্দী।

বসুদেবের মনে আর যখন কোন সংশয় রইল না যে, এই নবজাত শিশুটিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তখন তিনি করজোড়ে প্রণিপাত করে তাঁর বন্দনা করতে শুরু করলেন। বসুদেব তখন চিন্ময়স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে কংসের ভয় থেকে মুক্ত হলেন। সেই শিশুটির অঙ্গ-কান্তিতে সেই ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বসুদেব তখন প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে প্রিয় প্রভু, আমি জানি আপনি কে? আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং পরম সত্য। আপনি আপনার নিত্য স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যা আমি এখন সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আমি বুঝতে পারছি যে, যেহেতু আমি কংসের ভয়ে ভীত, তাই সেই ভয় থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্য আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি এই প্রকৃতির অতীত। আপনিই হচ্ছেন সেই পরম যিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই জড় জগৎকে প্রকাশিত করেন।

কৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বসুদেব সূতিকাগার থেকে তাঁর সন্তানটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময় গোকুলে নন্দ এবং যশোদার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তিনি ছিলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া। যোগমায়ার প্রভাবে কংসের প্রাসাদের প্রতিটি বাসিন্দা বিশেষ করে প্রহরীরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল এবং কারাগারের সব কটি দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল, যদিও সেগুলো খিল্ দেওয়া ছিল এবং লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল, সেই রাত্রিটি ছিল ঘোর অন্ধকার। কিন্তু যখনই বসুদেব তার শিশু সন্তানটিকে কোলে নিয়ে বাইরে এলেন, তিনি সবকিছু দিনের আলোর মত দেখতে পেলেন।

কারাগারের সবকটি দ্বার আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ঠিক সেই সময় গভীর ব্রজনিনাদের সংগে প্রবল বর্ষণ হতে শুরু করল। বসুদেব যখন তাঁর শিশুসন্তান কৃষ্ণকে নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান শেষ সর্পরূপ ধারণ করে, সেই বর্ষণ থেকে বসুদেবকে রক্ষা করার জন্য বসুদেবের মাথার উপরে তাঁর ফণা বিস্তার করলেন। বসুদেব যমুনার তীরে এসে দেখলেন যে, যমুনার জল প্রচন্ড গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। তার বিশাল তরঙ্গগুলি ফেনিলোচ্ছল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর রূপ সত্ত্বেও যমুনা বসুদেবকে যাওয়ার পথ করে দিলেন। ঠিক যেমন ভারত মহাসাগর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় তাঁর জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে বসুদেব যমুনা পার হয়ে অপর পাড়ে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, সমস্ত গোপ গোপীরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সেই সুযোগে তিনি নিঃশব্দে যশোদা মায়ের গৃহে প্রবেশ করে তাঁর পুত্রসন্তানটিকে সেখানে রেখে যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে এলেন এবং নিঃশব্দে দেবকীর কোলে কন্যাটিকে রাখলেন। তিনি নিজেকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন যাতে কংস বুঝতে না পারে যে ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে।

(শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

ইস্‌কন আজীবন সদস্য প্রসঙ্গে

যাঁরা ইস্‌কন আজীবন সদস্য হতে আগ্রহী তাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ইস্‌কন আজীবন সদস্য সেবা আনুকূল্য ফি বর্তমানে ১৫,৫৫৫.০০ টাকায় বর্ধিত করা হয়েছে। তাই বর্ধিত টাকা জমা দিয়ে আজই সদস্য হউন।

আন্তরিকভাবে দুঃখিত

ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানের দ্বাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সপ্তম পৃষ্ঠায় মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে ছবি ভুল ছাপা হয়েছে বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

বিশ্বমঙ্গল

-সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত জীবাত্মানিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতি সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমত কি, সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি সম্বন্ধে আমরা সর্বদা চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম। বৈষ্ণব সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ড-সংসার ততই হ্রাস পাইবে, – ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিকী-গতি। সেই অনন্তরূপী- পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক, পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণধর্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপা বলে সাধুসঙ্গ আশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, মধ্যমাধিকারী মহাত্মাগণ সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।" -উপক্রমণিকা কৃঃ সং

"আহা! যেদিন ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, ক্রোশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা - খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ-নিজ-নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্ব্বক হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ সকল 'জয় শচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন, --- হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে।"

-'নিত্যধর্ম- সূর্য্যোদয়', সঃতোঃ ৪/৩

"হে শুদ্ধভক্তবৃন্দ! শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগৎজীবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম আজকাল ধুমধামের সহিত দেশে দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই -সমস্ত ধর্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ-নিজ-দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরমধর্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। **এখন সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন।** ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গভক্ত ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎপাবন হরিনামকে প্রচার করুন।"
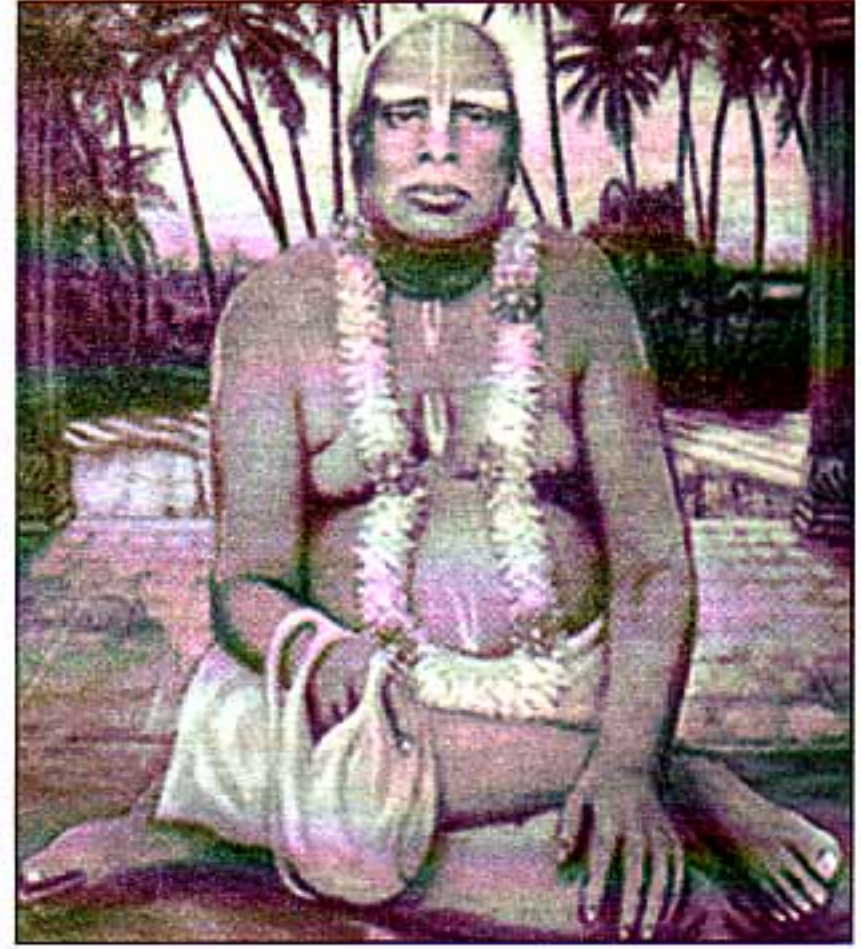
- 'শ্রী শ্রী নামহট্ট', বিঃ পঃ

"শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমন্নবদ্বীপ–ধামান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রই ঐ হাটের মূল স্থান। তথায় কতিপয় শুদ্ধ হরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব নামহট্টের কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। যাঁহারা কোন গণ্ডগ্রামে বা নগরে এক একটী প্রপন্নাশ্রম স্থাপনকরত নাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের 'দোকানদার' বা 'বিপণিপতি'। যাঁহারা নামের পসরা লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতেছে, তাঁহাদের নামই 'পসারী' বা 'ব্রাজকবিপণী'। গোদ্রুমকল্পাটবীতে কতকগুলি কর্মচারীর নাম প্রকাশিত হইয়াছে। জগজ্জনতারণ শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গপ্রভু বোধ হয়, পুনরায় স্বীয় প্রচারিত শুদ্ধনাম জগৎকে দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের এরূপ আশা হইতেছে যে, অতি অল্প কালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত

বৈষ্ণবধর্ম আম্লেচ্ছ পৃথিবীকে পবিত্র করিবে।"

"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাটের পর্বটি অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশ দূর হইবে এবং অবশেষে শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।"

- 'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

"বৈষ্ণব মহোদয়গণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, নোয়াখালি জেলায় একজন মুসলমান বিচারপূর্বক বৈষ্ণবধর্মকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া ঐ ধর্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা ব্যক্তি অনেক সুকৃতিবলে এরূপ সদ্‌গতি লাভ করিলেন। আশা করি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যবন ও ম্লেচ্ছমণ্ডলী ক্রমশঃ এই পবিত্র ধর্ম শীঘ্রই অঙ্গীকার করিবেন। খোল, করতাল ও কীর্তনের সুর যেরূপ প্রবলতা-সহকারে অন্যান্য ধর্মে প্রবেশ করিতেছে, **তাহাতে অতিশীঘ্র চৈতন্যধর্ম জগদ্ব্যাপী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।।"**

- সঃ তোঃ ২/৯ বাং ১২৯৩ "বৈষ্ণবধর্মের প্রচার"

"অদ্বিতীয় শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম অবিলম্বেই জগতে যে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোল-করতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরই ইংল্যাণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমত্ব নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণবকৃপায়ই যে সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাদের দেখলে নয়ন জুড়ে তারা দু-ভাই এসেছে" - এই সংগীতে খোল-করতালসহ নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে সংকীর্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও কীর্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না, কেননা কোনো ঘটনা একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপ প্রকাশ হইতে হইতে নির্মল হইয়া পড়ে।

'-নিত্য-ধর্মসূর্য্যোদয়',সঃ তোঃ ৪/৩

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্মসকলের হেয়াংশ দুরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ , জাতি, সর্বদেশের মনুষ্য একত্র হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নামসংকীর্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যাভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহ সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য ! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

- নিত্যধর্ম - সূর্য্যোদয় ', সঃ তোঃ ৪/৩

"Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that your own may not be numbered with the fanatics and the crazed and that the whole of mankind may be admitted as 'your own."--To Love God, "

-(Journal of Tajpur 25th Aug. 1871)

"এই (রস) ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি, তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতি -ঋণ শোধ করিতে পারিব না।- চৈ. শিঃ - উপসংহার

আনন্দ সংবাদ! শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ আনন্দ সংবাদ!!

হরেকৃষ্ণ,

শ্রদ্ধেয় গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, কৃষ্ণ প্রীতি গ্রহন করুন। কৃষ্ণভাবনা প্রচারের স্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশের ইস্‌কন দীক্ষিত ভক্তদের পরিসংখ্যান করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। তাই সকল ইস্‌কন মন্দিরে কার্যক্রম চলছে। আপনারা ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ স্ব-স্ব এলাকায় ইস্‌কন মন্দিরে গিয়ে নাম নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা
শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী
স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯,৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ৭১২২৪৮৮, ৭১২২৭৪৭
মোবাইল : ০১৭১৬-৮৩৪৮৯৫, ০১৭১১-৮৩২৭০৮

বিনয়াবনত-
শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
সাধারণ সম্পাদক
ইস্‌কন - বাংলাদেশ

শ্রীল প্রভুপাদ

-শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদকে সাধারণত সকলে স্বামীজী বলে সম্বোধন করত। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, পারমার্থিক গুরুর জন্য এই 'স্বামীজী' নামটি ঠিক উপযুক্ত নয়। তিনি যখন একথা বলেছিলেন, সে সময় মুকুন্দ সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি হয়ত আরো অনেকবার এ কথাটি বলেছিলেন, কিন্তু সেদিন আমার উপস্থিতিতে তিনি এ কথাটি আরেকবার বলেছিলেন। ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাহলে গুরুদেবকে সম্বোধন করবার উপযুক্ত নামটি কি? তারা আরো নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং জানতে চেয়েছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবকে কি বলে সম্বোধন করতেন?

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, 'প্রভুপাদ' নামটি হচ্ছে গুরুদেবকে সম্বোধন করবার জন্য উপযুক্ত একটি নাম এবং সেই থেকে ভক্তগণ তাঁকে শ্রীল প্রভুপাদ নামে সম্বোধন করতে শুরু করে। ১৯৬৮ সালে মন্ত্রিলে প্রথম মন্দির দর্শন কালে গোবিন্দ দাসীর ঘটনাটি আমার এখনো মনে আছে। আমার মনে আছে যে, শ্রীল প্রভুপাদকে স্বামীজী বলে সম্বোধন করবার জন্য তিনি গোবিন্দ দাসীকে তিরস্কার করেছিলেন– তবে ঠিক শাসন করছিলেন বলা যায় না– সেটা যে ঠিক উপযুক্ত নাম নয়, সে কথাটিই দৃঢ়ভাবে বোঝাচ্ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁকে গ্রন্থ রচনা ও বিতরণের জন্য শক্তি প্রদান করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য সেগুলি বিতরণ করেছিলেন। আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর জীবন ধারা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাবো যে, তাঁরা পবিত্র ধাম সমূহের পুনরুদ্ধার সাধন করেছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চেয়েছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রসার ঘটানোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হোক।

পূর্ববর্তী বিভিন্ন আচার্যবর্গ কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রসারের জন্য যে সমস্ত ভক্তিমূলক কার্য শুরু করেছিলেন, পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ একাকী সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছেন। তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই গ্রন্থ বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের সংঘ গঠন করেছেন এবং বৃন্দাবন ও মায়াপুরের মতো ভগবানের লীলাস্থলীগুলির পরিচয় ঘটিয়েছেন, যাতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে মানুষ সেই পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ সব সময় জোর দিয়ে বলতেন যে, প্রত্যেকেরই পূর্ববর্তী আচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য প্রয়াস করা উচিত এবং তাঁদের অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য প্রয়াস করা উচিত।
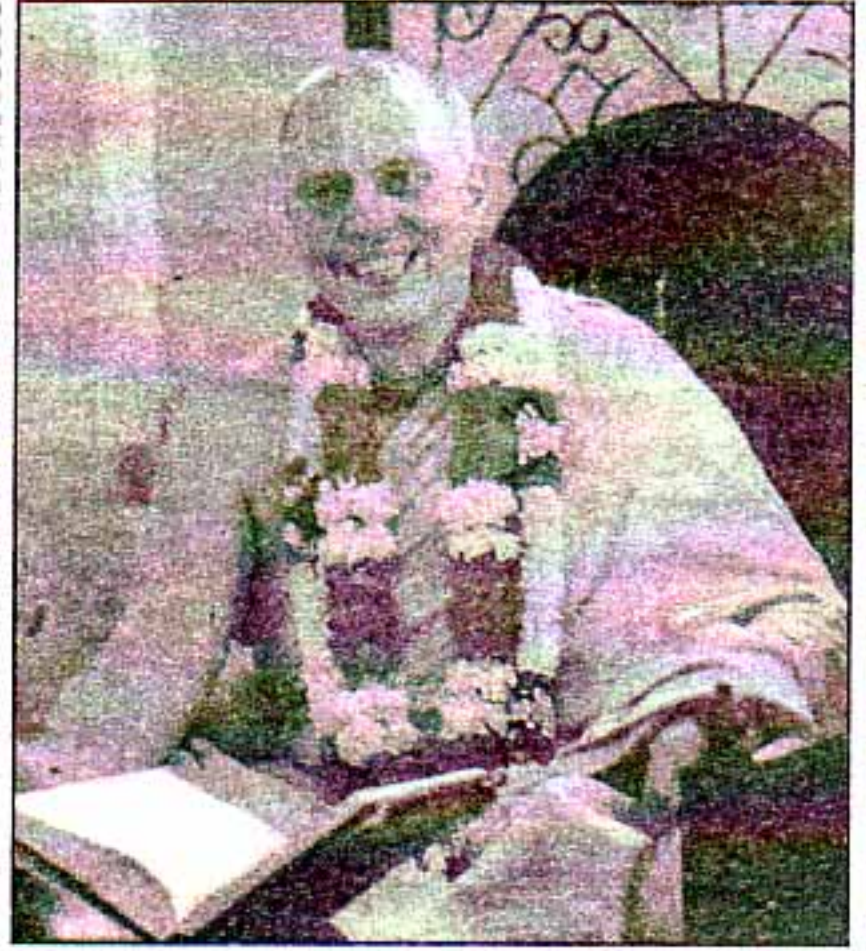
প্রকৃতপক্ষে, তিনি পূর্ববর্তী আচার্যগণের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী কোনো আচার্যের কোনো ইচ্ছা তিনি পূরণ করেননি, এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। যদিও আরো অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, কিন্তু সে সবই শ্রীল প্রভুপাদ যা করে গিয়েছেন, তার অগ্রনয়ন ঘটানোর কাজ।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৮-৬৯ সালে যখন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভারতবর্ষে চলে আসেন, তখন আমেরিকায় তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দ ভেবেছিল যে, তিনি হয়ত তাদের কাছে আর নাও ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ফিরে গিয়েছিলেন, তখন পূর্ব ও পশ্চিম আমেরিকা এবং কানাডার অনেক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদন জানাবার জন্য বোষ্টন বিমানবন্দরে সমবেত হয়েছিল। সেখানে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জনের মতো ভক্ত উপস্থিত হয়েছিল।

'শ্রীল প্রভুপাদ' লেখা একটি প্লাকার্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল এবং প্লেন এসে পৌঁছানো মাত্র সবাই উদ্দন্ড কীর্তন করতে শুরু করল। এই কীর্তন প্রসঙ্গে

সংবাদপত্রগুলি খবর প্রকাশ করে বলেছিল যে, ভক্তরা লাফিয়ে লাফিয়ে কীর্তন করছিল। একজন ভক্ত কীর্তন করতে করতে এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, সে প্রায় উন্মত্তের মতো করতাল বাজাচ্ছিল এবং সেই করতালের আঘাতে তার কপাল কেটে রক্তপাত হওয়া সত্ত্বেও সে তা বুঝতে পারে নি। সংবাদপত্রগুলি এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল যে, কিছু ভক্তের মাথা কেটে গিয়ে রক্ত পড়া সত্ত্বেও তারা সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না এবং কিছু ভক্ত এতই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করছিল যে, তাদের দেহ কাঁপছিল। এই সমস্ত কথাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কাস্‌টমস্‌ চেকিং এর জন্য শ্রীল প্রভুপাদকে সাত ফুট উঁচু পর্দা ঘেরা একটি জায়গায় যেতে হয়েছিল। কাস্‌টমসের চত্বরের ভিতরে ঠিক কি যে হচ্ছিল আমরা তা দেখতে পারছিলাম না। কিন্তু আমরা জানতাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্লেন এসে গেছে এবং কয়েকজন বেরিয়ে আসা যাত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম যে, তিনি এখনও ভেতরে আছেন। ভক্তরা কেউ তখনও তাঁকে এক পলকের জন্যও দেখতে পারেনি। প্রত্যেকেই কীর্তন করছিল। কিন্তু এক সময় শ্রীল প্রভুপাদ হাত উঁচু করবার ফলে পর্দার উপর দিয়ে যখন তাঁর জপমালাটি দেখা গেল, তখন সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ভক্তবৃন্দ হরিবোল, হরিবোল, ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস [illegible] করে তুলল এবং এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানালো। উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠবার ফলে অসাবধানতাবশতঃ ভক্তদের কারো কারো শরীরের কোথাও কেটে গিয়েছিল। এইসব দেখে সাংবাদিক ও টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

অল্প কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদ লবিতে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সমস্ত ভক্তবৃন্দ দণ্ডবৎ হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল। অধিকাংশ ভক্তই একটি করে ফুলের মালা আনবার ফলে সেদিন প্রায় ১৫০টি মালা জমা হয়েছিল । সেটি যেন একটি উৎসবের দিন ছিল। সেদিন প্রায় প্রত্যেকেই শ্রীল প্রভুপাদকে মালা অর্পণ করেছিল এবং তার ফলে শ্রীল প্রভুপাদের মাথা পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণই মালায় ঢেকে গিয়েছিল। তিনি একটি একটি করে মালা খুলে ফেলে ভক্তদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তিনি এতই করুণাময় ছিলেন যে, প্রত্যেকের মালা গ্রহণ করেছিলেন। বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিল। তারা কখনও কাউকে এই ধরনের এতটা শ্রদ্ধা বা সম্মান পেতে দেখেনি। এমনকি রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীও কখনও এই ধরনের অভিবাদন লাভ করে না। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বপ্রথমে যে শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, তা হলো "শ্রী গুরুদেব"। তিন বলেছিলেন, "এভাবে একজন মানুষকে সম্বর্ধিত হতে দেখে আপনারা হয়ত অবাক হতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব দেবতুল্য রূপেই পূজিত হয়ে থাকেন। তবে আরাধ্য গুরুদেব যদি কখনও মনে করেন যে তিনিই ভগবান তাহলে প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবান (God) নন, তিনি কুকুর (Dog)- সেই গুরু কুকুরের থেকেও এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর পশু।" এই কথা শুনে প্রত্যেকেই চমকে উঠেছিল। তাই, শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকা সবই তাঁর নিত্যলীলার অংশ। শ্রীল প্রভুপাদের যে সমস্ত চলচ্চিত্রগুলি তোলা হয়েছে, তার যে কোন একটি দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি মানুষের প্রতি কতখানি করুণাশীল ছিলেন। তিনি শুধু কৃষ্ণভাবনা প্রচার করতেন। যারাই তাঁর সান্নিধ্যে আসতো, তাদের সকলকেই তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত দান করতেন। কখনও কখনও কোন মানুষ চলে যাবার পর প্রভুপাদ বলতেন লোকটি সত্যিই খুব ভালো এবং এইভাবে তিনি তার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতেন। আমি ঠিক ঠিক ভাবে তাঁর কথাগুলি মনে করতে পারছি না। কোন কোন সময় তিনি এমনও বলতেন যে, মানুষটি অত্যন্ত মূর্খ অথবা অজ্ঞ অথবা একগুঁয়ে। তিনি বলতেন, "তোমরা কিভাবে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করবে, আমি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এসব করছি তোমাদের শেখবার জন্য। তোমাদের কি আর অন্য কোন প্রশ্ন আছে?"

একবার একজন ভক্ত তার পতিত হওয়ার কথা স্বীকার করবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কাছে এলে, তিনি তাকে আরো গভীর অনুরাগের সঙ্গে আবার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ একবার তাঁর ভাষ্যে বলেছিলেন যে, গুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্দিষ্টভাবে একদিক থেকে বিচার করেন না, সামগ্রিকভাবে শিষ্য কতখানি সেবাপরায়ণ, সেইদিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভগবৎ সেবা সম্পাদন করতে ইচ্ছুক হয়, গুরুদেব তাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত করে থাকেন। অবশ্যই, যদি কখনও কারো ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং তা সংশোধন করে দেওয়া গুরুদেবের পরম কর্তব্য। তেমনই, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ সেই নির্দেশ গ্রহণ করে তার সেবাকে কৃষ্ণসেবায় পরিবর্তিত করতে ইচ্ছুক হয়, শ্রীল প্রভুপাদ তাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রাখেন। প্রকৃতপক্ষে গুরুদেব কর্তৃক শাসিত হবার অর্থ হল, তার করুণা লাভ করা। শ্রীল প্রভুপাদ কিন্তু সকলকেই শাসন করতেন না। কিন্তু যিনি তাঁর দ্বারা শাসিত হতেন, তাঁর প্রতি প্রভুপাদের বিশেষ করুণা বর্ষিত হত। আমার মনে হয়, ভারতে আসবার আগে, আমি একবার সেরকমই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় আমি তা অনুভব করতে পারিনি। আমি তখন লস্‌ এঞ্জেলসে ছিলাম। একবার চরণামৃত গ্রহণ করবার সময় শ্রীল প্রভুপাদ টের পেলেন যে, চরণামৃতে চিনির পরিবর্তে নুন

মেশানো রয়েছে। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজে রেহাই পেতে চাইছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে চিনির জলের পরিবর্তে নুনজলে স্নান করানোর জন্য কে দায়ী তা প্রভুপাদ জানতে চাইলেন।

শেষ পর্যন্ত প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া গেল। প্রভুপাদ তাকে বললেন, "তুমি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করেছ, তুমি অত্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন।" এই কথা বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়েছিল এবং তাঁর তখনকার সেই অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শ্রীল প্রভুপাদ কোন শিষ্যকে কিছু নির্দেশ দেবার পর, অথবা কাউকে শাসন করবার পর কখনও কখনও বিনীতভাবে বলতেন, "আসলে, আমি খুবই কঠোর। আমি জানি না, তোমরা কিভাবে আমার দাপট সহ্য কর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে আমার কর্তব্য। গুরুদেবের কাজটি হচ্ছে অত্যন্ত দুরুহ। গুরুদেবকেই তাঁর শিষ্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করতে হয়।"

যদি কারো মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজে না পাওয়া যায়, শিষ্যের যদি কোন দোষ- ত্রুটিই না থাকে, তবে সে একজন শুদ্ধ ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত না হওয়ার কারনই হচ্ছে কিছু দোষ-ত্রুটি এবং কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকা, যার সংশোধন করা প্রয়োজন। কখনও কখনও শ্রীল প্রভুপাদ কোন শিষ্যকে সামনে শাসন করে যেতেন এবং নানারকম নির্দেশ দিতেন। এর ফলে সেই শাসিত শিষ্যের গুরু-ভাইয়েরা শিষ্যটিকে ভুল বুঝত। শাসিত শিষ্যকে সমালোচনা করে তাঁর অন্য কোন শিষ্য তাকে কিছু বললে, শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাসন করতেন। তিনি বলতেন, 'ওঃ, তুমি এখন খুব ওস্তাদ হয়ে গিয়েছ। তুমি এখন গুরু হয়ে গিয়েছ। তুমি আগে এই সমস্ত দোষ দেখতে পারনি। এখন আমি যা দেখছি, তুমি তা দেখছ। ইতিপূর্বে তুমি কোন উপদেশ দিতে পারনি। এখন তুমি উপদেশ দিচ্ছ। এমন নয় যে, প্রত্যেকেরই সমালোচনা করবার অধিকার রয়েছে। এটি হচ্ছে একমাত্র গুরুদেবের দায়িত্ব।

পারমার্থিক জীবনেও বিভিন্ন ধরনের সম্বন্ধ রয়েছে। শ্রীধাম মায়াপুরে কিছু ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। মায়াপুরে প্রচুর আখের গাছ রয়েছে। প্রতি বৎসর সেই আখ নিংড়ে রস বার করে গুড় তৈরী করা হয়। সেবার, সমস্ত আখগুলি রান্নাঘরের বাইরে স্তুপীকৃত করে জমিয়ে রাখা হয়েছিল। গুরুকুলের বালক ও শিশুরা সেই আখ খেতে খুব ভালবাসতো। ঐ স্থানটি ছিল আবার গৃহস্থদের আবাসগৃহের সামনে। গৃহস্থরা তাই আখ কেটে কেটে তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চিবোতে দিত। আখ চিবিয়ে রস খাবার পর তারা যেখানে সেখানে ছিবড়ে ফেলে রাখত। পরিষ্কার করার দায়িত্বে যে ছিল সে ঐ ছড়ানো ছিটানো ছিবড়াগুলি ঝাঁট দিয়ে তা ভগবানকে অ-নিবেদিত আখগুলির সঙ্গে জমিয়ে রেখেছিল। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ তা দেখতে পেয়ে ভারতীয় ভক্তদের শাসন করে বললেন, "তোমরা নরকে যাবার জন্য মন্দিরে এসেছ? তোমরা নিজেদের হিন্দু বলো, ভারতীয় বলো- কৃষ্ণকে নিবেদনের জন্য এই সমস্ত আখের সঙ্গে কে এইসব ছিবড়েগুলো ঝাড়ু দিয়ে রেখেছে? এই হচ্ছে তোমাদের সংস্কৃতি! এই কি তোমরা ছেলেবেলা থেকে শিখে আসছ!" তিনি সেদিন সেখানকার ভারতীয় ভক্তদের অত্যন্ত শাসন করেছিলেন।

সেই সময় হঠাৎ গুরুকুলের একটি ছোট ছেলে হাতে আখের একটি কাটা অংশ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে আসে। তা দেখে ষাট বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ ভক্ত তাড়াতাড়ি করে গিয়ে ছেলেটির হাত থেকে তা কেড়ে নিলে, বাচ্চা ছেলেটি কাঁদতে শুরু করে। বয়স্ক মানুষটি তখন বলতে থাকে -"এই, এখানে আখ নিয়ে কি করছিস?" তা দেখে শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, - "ওঃ খুব ওস্তাদি হচ্ছে। আমি যা বলছি তা তুমি আগে দেখতে পারনি? এখন তুমি একটা বাচ্চা ছেলের হাত থেকে আখ কেড়ে নিচ্ছ? এর আগে তোমার চোখ কি অন্ধ ছিল ? "

তাই এই সমালোচনা করা বা শাসন করার বিশেষ অধিকারটি কেবলমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। দায়িত্বপূর্ণ পদে যিনি রয়েছেন তাঁকে নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ মানুষদের উন্নতি বিধান করে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে আসবার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। সুতরাং এই দায়িত্বটি সম্পাদন করাই হচ্ছে তাঁর ভগবৎ-সেবা। কিন্তু সমালোচনা কোন কাজেই আসে না, যদি না তা গঠনমূলক হয়। প্রভুপাদ কখনও প্রকাশ্যে তাঁর গুরুভাইদের সমালোচনা করতেন না। কখনও কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক বিষয়ে মতান্তর হলে গুরুভাইদের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা বা তার সমালোচনা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর কোন একজন গুরুভাই তাঁর নিজস্ব প্রতিকৃতির চারধারে আলোকচ্ছটা ব্যবহার করার ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হয়ত সেই গুরুভাইয়ের কোন শিষ্য তাঁর ছবির চারদিকে আলোকচ্ছটা এঁকেছিল, কিন্তু প্রভুপাদ এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছবিতে কখনও এই ধরনের বর্ণচ্ছটা আঁকা হত না, তাহলে তিনি কেন তাঁর প্রতিকৃতিকে আলোকচ্ছটা ব্যবহার করবেন? তাঁর যা নেই, তিনি কেন তা কৃত্রিমভাবে আঁকবেন? কিন্তু এগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়। তিনি এগুলি বলেছিলেন, কেবলমাত্র আমাদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। যদি কোন শিষ্য তাঁর কাছে তাঁর গুরু-ভাইদের বিরুদ্ধে কিছু বলতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রোষভরে উত্তর দিতেন- "তারা তোমার গুরুভাই নয়, আমার গুরুভাই। আমার গুরুভাইকে তুমি সমালোচনা করবার কে?"

বঙ্গানুবাদ-মনীশ সিংহ রায়

কৃষ্ণভাবনামৃতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

আবিষ্কারকেরা কৃষ্ণসম্পদ চুরি করেন

- শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী (পি-এইচ.ডি)

এই বিশ্বব্রহ্মান্ড কি, এর আয়তন কি, এবং তা সৃষ্টির সময়ের পরিমাপ কতখানি, এসব বোঝার জন্য সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্ এবং জ্যোতির্বিদেরা নানা রকমের যান্ত্রিক কলাকৌশল (যেমন, দুরবীক্ষণ ইত্যাদি), স্বতঃসিদ্ধ সূত্রাবলী, অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বসম্ভার এবং ধারণাপ্রসূত নক্শার সাহায্যে প্রচন্ড সক্রিয়তার সাথে চেষ্টা করে চলেছেন।

বর্তমানে তাঁরা কল্পনা করছেন যে, সৌরমন্ডলে হয়তো একটি দশম গ্রহ রয়েছে এবং তার অবস্থান নির্ণয় করার জন্যও তাঁরা চেষ্টা চালাচ্ছেন (ডি রলিঙ্গ এবং এম্ হ্যামারটন- 'সৌরমন্ডলে দশম গ্রহ কি আছে?'

-"নেচার" পত্রিকা, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃঃ ৪৫৭)। এর যথার্থ উত্তর নির্ধারণে তাঁদের এই প্রচেষ্টায় তাঁরা কতটুকু সফল হবেন, তা একমাত্র কালক্রমেই জানা যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই যে, পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিজাত প্রকৃতির গোপন রহস্যের সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন তাঁরা কোন দিনও করতে পারবেন না। যে কোনও বিবেচক মানুষই বুঝতে পারে যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের আয়তন নির্ণয় করার স্বপ্ন দেখাটাও কত বড় বোকামির কাজ, যেহেতু মানুষ তার নিকটতম নক্ষত্র যে সূর্য, তারই প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরোপুরি কিছুই জানে না।

ডঃ ব্যাঙের দর্শনচিন্তার দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, তিন ফুট মাপের একটা কুয়োর মধ্যে ব্যাঙটা থাকে বলেই প্রশান্ত মহাসাগর যে কী বিরাট, তার সেই ধারণাই নেই, তবে সে কুয়োটার সাথে তুলনা দিয়ে কল্পনাই করতে থাকে যে, প্রশান্ত মহাসাগর বুঝি- পাঁচ ফুট কিংবা দশ ফুট চওড়া হলেও হতে পারে।

বিষয়বস্তুটা হল এই যে, আমাদের সীমিত উপায়-উপকরণাদির সাহায্যে অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের সম্যক্ উপলব্ধির উদ্যোগে নিতান্তই শক্তি-সামর্থ্য এবং সময়ের অপচয় মাত্র। প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে সেই জ্ঞানরাজি প্রকটিত হয়েই রয়েছে। মানুষকে শুধু পরম প্রামাণ্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সেই জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে।

এই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মান্ডের এবং দেবতা, মানুষ আর অন্যান্য জীবকুলের সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম থেকে৫ম
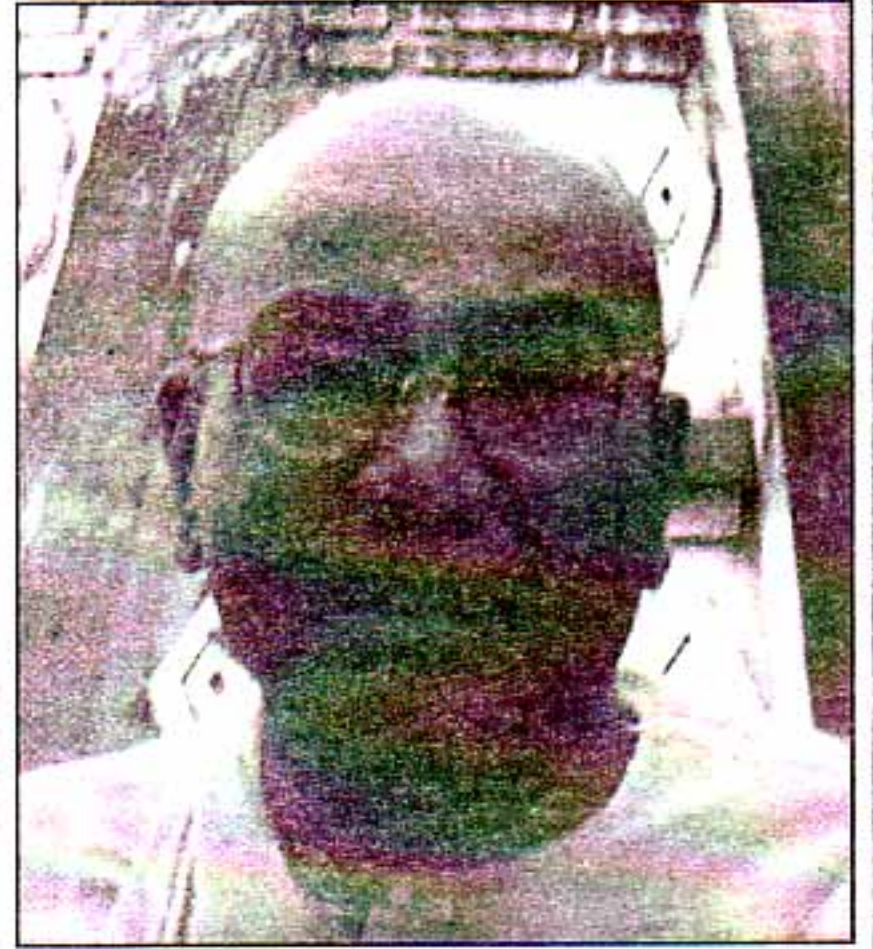
শ্লোকে দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে জড় এবং চিন্ময় ব্রহ্মান্ডের বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে এবং ভগবদ্গীতা থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি যে, সমগ্র জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মান্ডগুলি হল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। ভগবানের সৃষ্টি শক্তির আর বাকি তিন-চতুর্থাংশ বৈকুণ্ঠলোক নামে চিন্ময় আকাশে প্রকটিত হয়ে আছে।

পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এক অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে এই সমগ্র ব্রহ্মান্ডের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহাপ্রভু ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলির একটা সীমিত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ রয়েছে, কিন্তু কেউই বৈকুণ্ঠ গ্রহপুঞ্জের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিমাপ করতে পারে না। এই সব বৈকুণ্ঠ গ্রহগুলি একটি পদ্মফুলের পাপড়িগুলির মতো আর পদ্মফুলের বীজকোষটি হল সমস্ত বৈকুণ্ঠ গ্রহের কেন্দ্রস্থল। এই অংশটিকে বলা হয় কৃষ্ণলোক বা গোলোকবৃন্দাবন। এই গ্রহে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূল তথা নিত্য ধাম বিরাজমান। অন্যান্য সমস্ত বৈকুণ্ঠগ্রহগুলি ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং

বৈরাগ্যে পূর্ণ অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত এবং প্রত্যেক বৈকুণ্ঠগ্রহেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশপ্রকাশের নিত্যধাম রয়েছে (শ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শিক্ষা', পৃঃ ৮২-৮৩)। এই ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে জড়জাগতিক বৈজ্ঞানিকদের কোন সংবাদই জানা নেই।

নিঃসন্দেহে, জড়জাগতিক বিজ্ঞানীদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে না। আমাদের অকপটে স্বীকার করা উচিত যে, মানুষের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি, কলাকৌশল এবং বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তার দৃষ্টি ক্ষমতা সকল দিকেই চরম সীমিত। কেউ পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না, কারণ তিনিই হলেন সমস্ত কিছুর মালিক এবং তিনি সর্বজ্ঞ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'হে পার্থ, আমাকে স্থাবর জঙ্গম সর্বভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীর তেজ" (গীতা ৭/১০)। "হে ধনঞ্জয় (অর্জুন) আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

মণিহার যেমন সুতোয় গাঁথা থাকে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তেমনি আমাতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করে আছে"

(গীতা ৭/৭)।

একমাত্র বোকারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কে তর্ক করবে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং আসুরিক ভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয়না।

সুতরাং পরম বিজ্ঞানী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপত্তি জানানো, এবং অস্বীকার করার পরিবর্তে, ভগবানের অচিন্ত্য মস্তিষ্ক এবং সবখানেই তার চমকপ্রদ অভিপ্রকাশ হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক-বন্ধুদের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। কেউ হয়তো পেনিসিলিন, কম্পিউটার, দূরদর্শন, রেডিও ইত্যাদির আবিষ্কারের জন্য মিথ্যা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে । কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল এই যে, এই সব কিছুই আগে থেকেই হয়ে রয়েছে - কেননা, শূন্য থেকেতো কোনও কিছুর আবিষ্কার বা সৃষ্টি হতে পারে না। কেউ যদি দাবি করে যে, সে কোনও কিছুর মালিক, তা হলে সে সব চেয়ে বড় চোর। সে পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সম্পদ চুরি করে সেটা তার নিজের বলে দাবি করছে।

কোনও কিছুই আমাদের নয়। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীঈশোপনিষদ বলছেন, "এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পদ এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যাকে যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেইটুকুই তার গ্রহণ করা উচিত, এবং সব কিছুই যে তাঁর সম্পত্তি, তা ভালভাবে জেনে, কখনও তার অতিরিক্ত কোনও কিছুর আকাঙ্খা করা উচিত নয়।" (ঈশ-১) **অনুবাদ : প্রেমাঞ্জন দাস**

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মস্তিষ্কের ভিতর থেকে রক্ত নাক মুখ চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে প্রলম্বাসুর মুখ থুবড়ে পাথরের উপর পড়ল। তার কাঁধে চড়ে শিশু বলরাম এইভাবে আকাশ থেকে নেমে আসে। একদিন কৃষ্ণ গোচারণে গিয়েছে, বলরাম যায়নি। সেইদিন গাভী, বাছুর যমুনার জল পান করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। যমুনার জল থেকে বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। কালীয় নাগ নামে ভয়ংকর বিষধর সাপ যমুনার জলকে প্রচণ্ডভাবে বিষাক্ত করেছে। তাই কৃষ্ণ যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে কালীয়কে দমন করার জন্য গিয়েছে। সেই সময় চতুর্দিকে অমঙ্গলের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। সেই সময় কৃষ্ণের বিপদ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। মাতাপিতা সমস্ত গোপ-গোপীরা উন্মাদের মতো উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এল। মাঝ যমুনায় ভয়ংকর বহু ফণাযুক্ত বিষধর সর্পটি শিশুকৃষ্ণকে ভাল করে এঁটে সেঁটে লেজের কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর বিষ উদ্গীরণ করছে। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। তীরবর্তী মাতাপিতা ও অন্য সবাই তাদের প্রাণের ধন চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে দেখে নদীতে প্রাণ বিসর্জনের জন্য ঝাঁপ দিতে উন্মুখ হয়েছেন। তাঁদের সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে আটকে রাখল বালক বলরাম। "তোমরা কৃষ্ণের মহিমা কিছুই বোঝনি, তাই এরূপ করছো।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনের জন্য এই কলিযুগে শ্রীবলরাম শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হয়ে প্রতি ঘরে ঘরে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের শিক্ষা দান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীবলরাম থেকে অনন্ত অবতারের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীবলরাম শ্রীঅনন্তদেবরূপে ভগবানকে তাঁর কোলে আসনরূপে ধারণ করে থাকেন।

শ্রীবলরামের আবির্ভাব

- শ্রী সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবসুদেবপত্নী দেবকীদেবীর শিশুপুত্র একে একে নিষ্ঠুর কংসের হাতে নিহত হল। এবার সপ্তম গর্ভে বাস করতে লাগলেন স্বয়ং অনন্তদেব। কংস অনবরত চিন্তা করে চলেছে-দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র জন্মালেই সে আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাকে যে প্রকারেই হোক বধ করতেই হবে। এদিকে ভগবানের নির্দেশে যোগমায়া তাঁর অচিন্ত্য মহাযোগবলে দেবকী-গর্ভ বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তরিত করলেন। কংস-ভয়ে গোকুলে নন্দগৃহে লুকায়িত রোহিনী দেবীর কোলে শ্বেতকমলবর্ণ কোটি-কমনীয় অপূর্ব মোহন রূপ শ্রীবলরামের জন্ম হল। যোগমায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বসুদেব কোনও ক্রমে শিশুপুত্রকে নন্দালয়ে নিদ্রিতা যশোদার কাছে রেখে সদ্যোজাতা কন্যাকে মথুরায় নিয়ে যান।

শিশুদের নামকরণের কালে শ্রীগর্গমুনি আমন্ত্রিত হন। ধ্যানে জানতে পেরে শ্রীগর্গমুনি রোহিনীনন্দনের নামকরণ করেন। গর্ভ আকর্ষণ করে অনন্তদেবের জন্মলীলার জন্য তাঁর নাম 'সংকর্ষণ'। মনোরম রূপের জন্য 'বলরাম' এবং প্রচণ্ড বলবান হবে তাই শিশুর নাম 'বলভদ্র'। নন্দগৃহে দুই শিশু-বলরাম ও কৃষ্ণ রোহিণী-যশোমতীর দ্বারা লালিত-পালিত হতে থাকে। দুই দুষ্টু প্রকৃতির শিশুদের বহু মনোহর লীলাবিলাস গোকুলবাসী প্রত্যেকের মনে প্রতিদিন আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াত। শশিকলার মতো তাঁরা বড় হতে থাকে। তাঁরা অন্যান্য গোপশিশুদের নিয়ে গোপীদের গৃহে চুরি করতে যেত। টাকা পয়সা বা অন্য কিছু নয়, কেবল ননী-মাখন-দধি। নিজেরাই শুধু খেত না, বানর এবং কখনও কাকেরাও ননী খাওয়ার ভূমিকায় যোগ দিত। তারা গোপীদের গৃহে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকত, ননী আনতে গিয়ে হাঁড়ি ভাংত। তারা লুকিয়ে পালাত না। গোপীদের ঘুমন্ত বাচ্চার মুখে ননী মাখিয়ে, আবার চিমটি কেটে, বাছুরের দড়ি খুলে দিয়ে চম্পট দিত। আর ওই দলের বড় সর্দার হচ্ছে স্বয়ং বলরাম। সাধারণত লোকে চোরদের কখনও পছন্দ করে না। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম যেদিন যার গৃহে ননী চুরি করতে যেত না, সেই দিন সেই গৃহের মাতৃসমা গোপীরা মনে মনে দুঃখ পেত। আবার, ননী চুরি হলে কৃষ্ণ-বলরামের নামে তাদের মায়ের কাছে গিয়ে নালিশও করত। আবার কৃষ্ণ-বলরামকে শায়েস্তা করা

হোক-তাও তারা একেবারেই চাইত না। বনে গোচারণে ক্লান্ত হয়ে বলরাম কোনও বালকের কোলে মাথা রেখে ঘুমাত। কৃষ্ণ তার পাদপদ্ম সেবা করত। অন্য বালকেরা কেউ পলাশ পাতায় বাতাস করত, কেউ জল আনত। একদিন প্রলম্ব নামে এক ভয়ংকর অসুর গোপবালকের রূপ ধারণ করে তাদের সঙ্গে মিতালি শুরু করল। কারণ সেই মায়াবী অসুরটি ছিল কংসের অনুচর। তার ধান্দা ছিল কৃষ্ণকে কোনও ক্রমে হরণ করে মেরে ফেলা। সেদিন বালকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে হারজিতের কোনও খেলা খেলছিল।

একটি কৃষ্ণের দল, অন্যটি বলরামের দল। তাদের কথা হয়েছিল যে, যে দল হারবে সেই দলের বালকেরা বিজয়ীদেরকে কাঁধে নিয়ে ঘোরাবে। বলরামের দল জিতেছে, তাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের দলের ছেলেরা বলরামের দলকে নিয়ে ঘোরাতে লাগল। কৃষ্ণের দলের ছদ্মবেশী প্রলম্বাসুর শীঘ্রই বলরামকে কাঁদে নিয়ে দ্রুত ছেলেদের দল থেকে সরে গিয়ে আড়াল হয়ে উঁচু আকাশের দিকে নিয়ে চলল। অসুরটির পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড দেহ প্রকাশিত হল। শিশু বলরাম সেই অসুরের মাথার জটা-চুল আঁকড়ে ধরে ছিল। বলরাম অত্যন্ত ভারী হয়ে যায়। অসুর তাকে মাথা ঝেড়ে নীচে ফেলে দিতে চায়। কিন্তু বলরাম তার ছোট্ট হাতের একটি জোর ঘুসি লাগিয়ে দিল প্রলম্বাসুরের মাথায়।

(বাকী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঝুলন দোলায় সাপ

- শ্রী সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা রাত্রি। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় আলোকিত। ব্রজভূমির সবুজ শ্যামল বনানী ঝলমল করছে। নানা ফুলের সুবাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। একটি কদম্ব গাছের কাছে কয়েকজন বালিকা জড়ো হয়েছে। তাদের অঙ্গদ্যুতি ও ভূবন ভুলানো মনোহর চাঁদমুখের হাসি সেই চাঁদনী রাতের সৌন্দর্যকে প্রভাবিত করছে। তাঁরা সেই কদম গাছের ডালে ফুলপাতায় ভরা একটি ঝুলন দোলন খাটিয়েছে। সেই দোলনায় একজন দ্যুতিময়ী কিশোরী বালিকাকে বসিয়ে কয়েকজন তাঁকে সাজিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ দোলনায় দোল দিচ্ছে, কেউবা গুণ্ গুণ্ করে গান করছে।

কাছের শ্রীরাধাকুণ্ড তটে এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঝুলন দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি আঁতকে উঠলেন। দেখলেন, একটি বিশাল ফণাযুক্ত লম্বা বিষধর সাপ দোলনায় বসে থাকা দ্যুতিময়ী বালিকার পিঠের ওপর দিয়ে মাথায় উঠছে। আর সেই বালিকাটি ঝুলন খেলায় এমন মেতেছে যে, সেই সাপের দিকে তার ভ্রূক্ষেপই নেই।

বিষধর ফণী থেকে বালিকাটিকে রক্ষা করবার জন্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী চিৎকার করে বলতে বলতে দৌড়ালেন-"ওরে পাগলী মেয়ে, তুই কি খেলা শুরু করেছিস, তোর মাথায় সাপটাকে দেখতে পাচ্ছিস্ না? তোর কি কোনও ভয় নেই"?

তাঁর কথা শুনেই সেই সকল চঞ্চলা বালিকারা খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল। রঘুনাথ দাস গোস্বামী দেখলেন- কেউ কোথায় নেই, দোলনাও নেই। বালিকারা উধাও। অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ তিনি দাঁড়িয়েই থাকলেন। কদম্বফুলের ছড়ানো সৌরভ, ইতস্তত জোনাকির আলো, পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্রপ্রভা, প্রবাহমান স্নিগ্ধ সমীরণ, আকাশে ইতস্তত ভাসমান মেঘপুঞ্জ, শ্রীরাধাকুণ্ডের স্নেহময় জলরাশি ইত্যাদি নিরীক্ষণ করতে করতে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন, 'কিরকম কি যে সব দেখলাম! না কি এটা আমার ভ্রম মাত্র'? তারপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তন করতে করতে তিনি কুটিরে ফিরে এলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি ব্যাপারটা পরিস্কার বুঝতে পারলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল রূপ

গোস্বামী "শ্রীচাটু পুষ্পাঞ্জলি" নামক একটি সর্বাকর্ষক শ্রীরাধাস্তব লিখেছিলেন। সেই স্তবটি মন দিয়ে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী পাঠ করেছিলেন। তাতে মুখবন্ধ অংশে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতি রাধারাণীর অঙ্গকান্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি শ্লোক লেখা ছিল-

নবগোরোচনা গৌরী
প্রবরেন্দী বরাম্বরাম।
মণিস্তবক-বিদোতি
বেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম॥

...শ্রীমতি রাধারাণীর মস্তকের বেণী সাপের ফণার মতো শোভাযুক্ত। এই কথাটি পড়ে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী চিন্তা করেছিলেন, বিষধর সাপের ফণা থাকে। বেণীর সঙ্গে ফণার তুলনাটি যুক্তিযুক্ত কি করে হতে পারে? কিন্তু সেই দিন অদ্ভুত ঝুলন দোলায় সেই ঘটনা দর্শনের পর তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপমার কথা বুঝতে পারলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ এই যে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দিব্য আনন্দময় ঝুলন যাত্রা অনুষ্ঠান করলে তাঁদের কৃপাদৃষ্টিতে ধরাতলে মনুষ্য জন্ম ধন্য হবে এবং তাঁদের অভয়চরণকমলের সেবা লাভ হবে।

আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম

নিষ্ঠার সাথে 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' নামক গ্রন্থখানি আমি পড়েছিলাম একটি বছর ধরে এবং তার পরে একটি বছর ধরে মন্দিরে যাতায়াত করতাম, আর তার পরে মন্দিরে যোগ দিলাম। - শ্রীমদ্ হনুমৎপ্রেষক স্বামী মহারাজ

বছর ছয়েক আগে শিবরাত্রির পুণ্যদিবসে আমাদের অতি প্রিয় গুরুভ্রাতা শ্রীবুদ্ধিমন্ত দাস অপ্রকট হয়েছেন। বেশ মনে পড়ে, তিনিই আমাকে প্রথম কৃষ্ণগ্রন্থখানি বিক্রি করেছিলেন।

১৯৭২ সাল নাগাদ ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিস ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে- কি করা যায় সেই মতলবে।

সেইখানেই বুদ্ধিমন্ত দাস প্রভু এক সময়ে একটা উৎসব প্রাঙ্গণে আমাকে পেয়ে প্রায় মিনিট পনের ধরে বুঝিয়েছিলেন একখানি গ্রন্থ নেওয়ার জন্য।

শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি আমি নিয়েছিলাম ১০ ডলার দিয়ে। তাতে আমার তখনকার স্ত্রী দেবোরা জেন গ্রাফ ভারি বিরক্ত হয়েছিলেন। তাকে খুশি করা আর গ্রন্থখানি কিনে ফেলা -এই দুটির মধ্যে আমি ভেবে চিন্তেই শেষটি বেছে নিয়েছিলাম (আর আমার মনে হল - ঠিকই করেছি)

গ্রন্থখানি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ' - দ্বিতীয় ভাগ, বোর্ড বাঁধানো। দারুণ নিষ্ঠার সাথে তা আমি পড়েছিলাম একটি বছর ধরে এবং তার পরে একটি বছর ধরে মন্দিরে যাতায়াত করতাম, আর তার পরে মন্দিরে যোগ দিলাম। ১৯৭৪ সনে নভেম্বরে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে শিষ্য করে নিলেন।

আজ ২৫ বছর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের সান্নিধ্যে পারমার্থিক জীবনে বিকাশ লাভের চেষ্টা করে চলেছি। শ্রীপাদ বুদ্ধিমন্ত প্রভু সেই সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন। আরও কত জনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ইস্কনকে সুসংবদ্ধ রাখছি। আমাদের মধ্যে রয়েছেন মন্দিরের অধ্যক্ষরা, ছাত্র-ছাত্রীরা, পূজারী, রন্ধন সহায়কেরা, এমন কি বাসন পরিষ্কারের সহযোগীরাও। ছোট-বড় সবাই মিলে আমরা ইস্কনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহযোগিতা করে চলেছি। এইভাবেই শ্রীল প্রভুপাদের আরব্ধ মহামন্ত্র প্রচারযজ্ঞে সামিল হওয়ার সুযোগ আমরা লাভ করেছি। সেই ব্রত সাধনের মাধ্যমেই আমরা পবিত্রতা অর্জন করছি এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁকে ক্রমশই আরও বেশি করে জানছি।

বুদ্ধিমন্তই আমাকে কৃষ্ণভক্ত করেছিলেন। ইস্কন এখন আমাকে ভক্ত হয়ে উঠতে সুযোগ দিচ্ছে। এই সবই কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদেরই কৃপার অভিব্যক্তি।

শ্রীল প্রভুপাদ নিত্য সঙ্গীরূপে নিত্য সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের ভগবদ্ধামে গোলোকে যাওয়ার পথ করে দিয়েছেন। তাঁর কৃপা ব্যতীত আমরা কখনই আমাদের সেবাকার্যে উন্নতি করতে বা সিদ্ধিলাভ করতে পারব না। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর কৃপা নিয়ে সদা সর্বদাই আমাদের সাথে রয়েছেন, তাই আমরা যতই অগ্রসর হচ্ছি- ততই শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্যের গভীরতা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করতে পারছি। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যিনি এক এবং বহুরূপে চরাচরে বিরাজমান, সেই পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করে তাঁর ভক্ত হওয়ার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। ভগবদ্গীতার শেষাংশে শ্রীল প্রভুপাদ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, গুরুপরম্পরায় আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করলেও আমাদের কৃষ্ণ উপলব্ধি হয় সাক্ষাৎভাবে। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই আমাদের কৃষ্ণোন্মুখ করে তুলেছেন- দেখ! এই তো শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে গ্রহণ করো। হরে কৃষ্ণ!

তাই জন্ম জন্মান্তরে যাঁরা আমাকে এই পথে সাহায্য করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই। বুদ্ধিমন্তের কাছ থেকে যখন সেই কৃষ্ণগ্রন্থখানি আমি পেয়েছিলাম, তখন আমার মধ্যে প্রস্তুতি এসে গিয়েছিল। শৈশবে আমার মা গ্ল্যাডিস বয়েড প্রতিরাত্রে ঈশ্বরের প্রার্থনা শেখাতেন, প্রায়ই গির্জায় নিয়ে যেতেন এবং ছোট ছোট বই পড়তে দিতেন খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে।

তবে ঈশ্বর চিন্তার দিকে ভগবান আমাকে এবং আমাদের সকলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন একটা মৃত্যুভয়ের মাধ্যমে। মনে পড়ে, ছ'বছর বয়সে বাস্তবিকই ভগবানের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা জানাতাম -তখন স্কুলে দু'বছর হল পড়ছি। তখন বুঝতে পারলাম- কেন জানি না- শীঘ্রই আমাদের মরতে হবে। বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলাম, মা- বাবার প্রশ্নের জবাব দিতাম না- জানতাম, তাঁরা আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না, তাঁদের সাথে আলোচনা করলে আমার মনের সমস্যা কেবল বেড়েই উঠত।

তাই প্রতিরাত্রে ঘুমের আগে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতাম। ক্রমে উপলব্ধি হতে লাগল- ভগবান আমাদের রক্ষা করতে পারেন। সেই ভরসা আমাকে হতাশা বিষাদ থেকে বাঁচাতে পেরেছিল। সুস্থির হয়েছিলাম।

অবশ্য বড় হয়ে ক্রমে নানা দার্শনিক ও লেখকদের বই থেকে কর্ম ও ভক্তি সম্পর্কে বহু তত্ত্ব জেনেছিলাম, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের সাথে পরিচিত হওয়ার আগেই। তখন থেকেই বুঝতাম, নিশ্চয়ই ইহজন্মের আগে থেকেই কিছু একটা আমাদের মধ্যে প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়ে এসেছে। কারণ আমি যে বিষয় নিয়ে আগ্রহী হতাম এবং তৃপ্তি পেতাম অন্যদের মধ্যে প্রায় কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামাত বলে আমি জানতাম না। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রামে আমরা হরিনাম সংকীর্তন দল পাঠাচ্ছি যারা ভগবদ্ভক্ত হতে চায়, তাদের খুঁজে আনার উদ্দেশ্যে। আর যারা এখনও ভগবদ্ভক্তি চর্চায় উন্মুখ হয়নি, তাদের সাথে সংকীর্তন দলের সংযোগের মাধ্যমে পরজন্মে তাদের মধ্যে ভগবদ্ভক্তি জাগিয়ে তোলার পথ সুগম করা হচ্ছে।

তাই ধন্যবাদ জানাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে, ধন্যবাদ জানাই শ্রীল প্রভুপাদকে এবং আমার গতজন্ম আর ইহজন্মের সমস্ত সংকীর্তন ভক্তমণ্ডলীকে -কারণ তাঁদেরই কৃপায় আমি ভক্ত হয়ে উঠছি।

(সাক্ষাৎকার : সুরেন্দ্র গৌরাঙ্গ দাস)

জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যের অজ্ঞতা

-শ্রী অখিলাত্মানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নন্দ মহারাজের নবজাত শিশু কৃষ্ণের জন্মোৎসব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে বৃন্দাবনে সর্বত্র মহা আনন্দোৎসব হয়। সকলেই আনন্দে মগ্ন হয়। ব্রজরাজ নন্দ তাঁর শিশুর জন্ম উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত সকলের বাসনা অনুসারে দান করেন। নন্দ মহারাজের বাসস্থান ব্রজপুর বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা, ফুলের মালার দ্বারা নির্মিত তোরণ, বস্ত্রখণ্ড এবং আম্রপল্লবের দ্বারা সুসজ্জিত হয়েছিল। গৃহের অঙ্গন, দ্বার ও মধ্যভাগ সুন্দরভাবে মার্জিত করা হয়েছিল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে সর্বত্র ধুয়ে মুছে ঝকঝকে তক্‌তকে করা হয়েছিল।

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে গো-জাতির বিশেষ যত্ন করা হত, তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঘরে ঘরে গাভীদের শরীরে হলুদ, তেল এবং নানা রং দিয়ে বিচিত্রভাবে তাদের সাজানো হয়েছিল, তাদের মাথায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে ভূষিত করা হয় এবং ফুলমালা, মূল্যবান বস্ত্র আর স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়েও তাদের বর্ণাঢ্য করে তোলা হয়। মহোৎসবের দিনে গোরক্ষার (গীতা ১৮/৪৪) এই ভারতীয় বৈদিক রীতি আজ মানুষ ভুলে গেছে বলেই এক আত্মবিস্মৃত উন্মাদপ্রায় জাতিতে অধঃপতিত হয়েছে।

ব্রজধামের গোপালকেরা বহুমূল্য বস্ত্র, আবরণ, উৎসবের পোশাক এবং উষ্ণীষে শোভিত হয়ে নানা প্রকার উপহার হাতে নিয়ে নন্দ মহারাজের বাড়িতে এসেছিলেন। এই ছিল সেই যুগের আনন্দ উৎসবের ছবি।

মা যশোদার একটি পুত্র হয়েছে জেনে গোপীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা বস্ত্র, অলঙ্কার, কাজল প্রভৃতি দিয়ে নিজেদের সাজাতে শুরু করেছিলেন। নববিকশিত কুঙ্কুমের কেশরে মুখপদ্ম সুশোভিত করে, গোপস্ত্রীগণ উপহার হাতে নিয়ে মা যশোদার বাড়িতে চলেছিলেন।

গোপীদের কানে অত্যন্ত উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল এবং গলায় পদক আর দু'হাতে বালা শোভা পাচ্ছিল। তাঁরা নানা বিচিত্র বসনাদি পরেছিলেন এবং তাঁদের কেশাগ্র থেকে পথে ফুল ঝরে পড়ছিল।

গোপস্ত্রী এবং গোপকন্যারা নবজাত শিশু কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তুমি ব্রজের রাজা হয়ে সমস্ত ব্রজবাসীদের পালন কর।" তাঁরা তেল-হলুদ মেশানো জল দিয়ে শিশু কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করে তাঁর স্তুতিগান করেছিলেন।

এইভাবে বিশ্বেশ্বর অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে সমাগত হলে, এক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং তখন বিচিত্র বাদ্যাদি চতুর্দিক থেকে বেজে উঠেছিল।

মহামতি নন্দ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে সমাগত সমস্ত গোপ-গোপীদের জন্য বস্ত্রাদি, বিবিধ অলঙ্কার এবং গাভী প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তার ফলে সর্বতোভাবে তাঁর পুত্রের মঙ্গল বিধান করেছিলেন।

উৎসব উপলক্ষে দান-দাক্ষিণ্যে এই ভারতীয় সনাতন রীতি আজকের দিনে আত্মকেন্দ্রিক (কারণ দারিদ্র্যগ্রস্থ?) সমাজে প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে। আজকাল সন্তানের জন্মোৎসব তথা বার্থ-ডে পার্টিতে নিজেরাই বাড়িতে বেজায় খানাপিনা আর হৈ-হুল্লোড়ে কাটাতেই ভালবাসে।

যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের সময়ে সর্বত্র যে অভূতপূর্ব দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় থেকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখনিঃসৃত সেই বর্ণনা অনুধাবন করলে 'জন্মাষ্টমী' উৎসবের বিপুল তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের শুভক্ষণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বগুণ, সৌন্দর্য এবং শান্তিতে পূর্ণ হয়েছিল। তখন রোহিণী, অশ্বিনী আদি নক্ষত্রগুলি আবির্ভূত হয়েছিল। সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সব গ্রহ ও তারকা শান্তভাব ধারণ করেছিল সমগ্র দিক অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং মেঘশূন্য আকাশে সুন্দর তারকাবাজি ঝলমল করেছিল। নগর, গ্রাম, খনি এবং গোচারণভূমির দ্বারা অলংকৃত পৃথিবী তখন এক মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেছিল। স্বচ্ছ জলে পূর্ণ হয়ে নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছিল এবং হ্রদ আদি বিশাল জলাশয়গুলি পদ্মফুলে পূর্ণ হয়ে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ধারণ করেছিল। ফুল এবং পত্রে পূর্ণ মনোহর গাছগুলিতে কোকিল ইত্যাদি পাখিরা এবং মৌমাছিরা মধুর স্বরে গুঞ্জন করছিল। পুণ্য গন্ধবাহী সুখস্পর্শ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা যখন তাঁদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন, তখন সেই অগ্নি বায়ুর দ্বারা বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে জ্বলতে লাগল। এইভাবে যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাবের সময় হল, তখন নিপীড়িত সাধু এবং ব্রাহ্মণেরা অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করলেন এবং তখন স্বর্গলোকে দুন্দুভি বাজতে লাগল।

আকাশে তখন মেঘেরা সমুদ্র তরঙ্গের ধ্বনির অনুকরণে মৃদু মৃদু গর্জন করতে লাগল। তখন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণু পূর্বদিকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কেউ প্রতিবাদ উত্থাপন করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, তখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় সম্ভব নয়। তার উত্তরে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাগবত ভাষ্যকার শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই সেই রাত্রে চন্দ্র অপূর্ণ থাকলেও, তাঁর বংশে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র আনন্দে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন।

যারা পূর্ণরূপে অবগত নয় যে, ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিব্য ঘটনা (জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্-গীতা ৪/৯), তারা বিস্মিত হয়ে ভাবে ভগবান কেমন করে একজন সাধারণ শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে , ভগবানের জন্য সাধারণ ঘটনা নয়। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অর্ন্তযামী পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তিসহ দেবকীমাতার হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন, তাই তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তিসহ দেবকীমাতার হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহের বাইরেও আবির্ভূত হতে পারে বৈকী! অজোহপি সন্নব্যয়াত্ম ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ (গীতা ৪/৬)। ভগবান জন্মরহিত এবং তিনি সব কিছুর পরম ঈশ্বর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের মতো আবির্ভূত ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের আবির্ভাবের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করে, মানুষের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ শিশুর মতো জন্মেছিলেন।

বসুদেব কারাগারের মধ্যে নবজাত শিশু কৃষ্ণকে দেখলেন- তাঁর নয়নযুগল পদ্মের মতো, তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তুভমণি বিরাজমান। তাঁর পরণে পীত বসন, তাঁর অঙ্গকান্তি নিবিড় মেঘের মতো শ্যামল তাঁর কেশদাম উজ্জ্বল এবং তাঁর মুকুট ও কর্ণকুণ্ডল বৈদুর্যমণিচ্ছটায় অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল। সেই শিশুটি অত্যন্ত দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভিত। (ভাগবত ১০/৩/৯-১০)

কোনো সাধারণ নরশিশু কখনও চতুর্ভুজরূপে জন্মগ্রহণ করেনি। তা ছাড়া নবজাত শিশুরও কোনদিন মাথায় চুল থাকে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সাধারণ নরশিশু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অসাধারণ পুত্রটি দর্শন করে বসুদেব যে যে কারণে বিস্মিত হয়েছিলেন, তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, বসুদেবের প্রথম বিস্ময় ছিল– কংসের কারাগারে আবির্ভূত হতে ভগবান ভয় পাননি। দ্বিতীয় বিস্ময়– ভগবান যদিও সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্ম, তবুও তিনি দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৃতীয় বিস্ময়– এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে। চতুর্থ বিস্ময়– ভগবান ছিলেন বসুদেবের আরাধ্যদেব, তবুও তিনি তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই সমস্ত কারণে বসুদেব চিন্ময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের জন্ম উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করতে ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কারাগারে বন্দী থাকার ফলে প্রত্যক্ষভাবে তা করতে পারেননি, তাই তিনি মনে মনে সেই উৎসব উদ্‌যাপন করেছিলেন।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর ভাগবত-ভাষ্যের তাৎপর্যে (১০/৩/১১) এই বিষয়ে লিখেছেন, বসুদেবের মানসিক জন্মাষ্টমী উৎসব এবং প্রত্যক্ষ উৎসবের মধ্যে কেনো পার্থক্য ছিল না। কেউ যদি বাহ্যত ভগবানের সেবা না করতে পারেন, তা হলে তাঁর মনে মনে তিনি ভগবানের সেবা করতে পারেন। যেহেতু মনের ক্রিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির মতো, তাই তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একে বলা হয় অদ্বয়জ্ঞান। মানুষ তো সাধারণত পুত্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উদযাপন করেই থাকে। তা হলে ভগবান যখন পুত্ররূপে এই ধরাধামে আবির্ভূত হলেন, তখন বসুদেবের মতো সকলে কেন উৎসব অনুষ্ঠান করবেন না? আমরা সকলেই তো ভগবানের সন্তান।

বাস্তবিকই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য গভীর বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করতে হয়। প্রতি বছর অন্তত জন্মাষ্টমী তিথিতে প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধটি থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মাহাত্ম্য পাঠপ্রবচনের মাধ্যমে উপলব্ধির আয়োজন থাকা উচিত। সারা বছরে সমগ্র দেশে কত রকমের বারমাসে তেরো পার্বণের উৎসব অনুষ্ঠানে মানুষকে মাতিয়ে তোলা হয়, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে এক শিশুরূপে এই ভারতভূমিতেই পাঁচ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়ে বিস্ময়কর লীলা প্রদর্শন করে গেছেন, তা নিয়ে মহোৎসবের আয়োজনে বিশেষ

(বাকী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

গৌড়ীয় মঠ ইস্‌কন-এর চার্টের মধ্যে একাদশীর দিন নির্ধারণে মিল এবং অমিল

গৌড়ীয় মঠ			ইস্‌কন		
+পাপমোচনী একাদশী	শনিবার	২৫-৩-২০০৬	+পাপমোচনী একাদশী	রবিবার	২৬-৩-২০০৬
কামদা একাদশী	রবিবার	৯-৪-২০০৬	কামদা একাদশী	রবিবার	৯-৪-২০০৬
বরুথিনী একাদশী	সোমবার	২৪-৪-২০০৬	বরুথিনী একাদশী	সোমবার	২৪-৪-২০০৬
* মোহিনী একাদশী	মঙ্গলবার	৯-৫-২০০৬	* মোহিনী একাদশী	মঙ্গলবার	৯-৫-২০০৬
অপরা একাদশী	মঙ্গলবার	২৩-৫-২০০৬	অপরা একাদশী	মঙ্গলবার	২৩-৫-২০০৬
পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী	বুধবার	৭-৬-২০০৬	পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী	বুধবার	৭-৬-২০০৬
+যোগিনী একাদশী	বৃহঃবার	২২-৬-২০০৬	+যোগিনী একাদশী	বুধবার	২১-৬-২০০৬
শয়ন একাদশী	শুক্রবার	৭-৭-২০০৬	শয়ন একাদশী	শুক্রবার	৭-৭-২০০৬
কামিকা একাদশী	শুক্রবার	২১-৭-২০০৬	কামিকা একাদশী	শুক্রবার	২১-৭-২০০৬
+পবিত্রারোপন একাদশী	শনিবার	৫-৮-২০০৬	+পবিত্রারোপন একাদশী	রবিবার	৬-৮-২০০৬
অন্নদা একাদশী	শনিবার	১৯-৮-২০০৬	অন্নদা একাদশী	শনিবার	১৯-৮-২০০৬
ইন্দিরা একাদশী	সোমবার	১৮-৯-২০০৬	ইন্দিরা একাদশী	সোমবার	১৮-৯-২০০৬
পাশাঙ্কুশা একাদশী	মঙ্গলবার	৩-১০-২০০৬	পাশাঙ্কুশা একাদশী	মঙ্গলবার	৩-১০-২০০৬
উৎপন্না একাদশী	বৃহঃবার	১৬-১১-২০০৬	উৎপন্না একাদশী	বৃহঃবার	১৬-১১-২০০৬
মোক্ষদা একাদশী	শুক্রবার	১-১২-২০০৬	মোক্ষদা একাদশী	শুক্রবার	১-১২-২০০৬
সফলা একাদশী	শনিবার	১৬-১২-২০০৬	সফলা একাদশী	শনিবার	১৬-১২-২০০৬
পুত্রদা একাদশী	শনিবার	৩০-১২-২০০৬	পুত্রদা একাদশী	শনিবার	৩০-১২-২০০৬

*** গৌড়ীয় মঠ একে উন্মিলিনী মহাদ্বাদশী বলেছে।**

+ এক্ষেত্রে গৌড়ীয় মঠ ও ইস্‌কনের তারিখের মধ্যে পাথর্ক্য আছে।

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় পাপ মোচনী/পাপনাশিনী একাদশী, যোগিনী একাদশী এবং পবিত্রারোপন একাদশীর দিন নির্ধারণ সম্পর্কে গৌড়ীয় মঠ এবং ইস্‌কনের মধ্যে অমিল বা পার্থক্য আছে। **এর কারণ কি দেখা যাক।**

১. পাপমোচনী একাদশী ঃ গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী ২৫/৩/২০০৬ইং তারিখে শনিবার একাদশীর দিন ধার্য্য ছিল। ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত চার্ট অনুযায়ী এই একাদশীর দিন ছিল রবিবার ২৬/৩/২০০৬ইং তারিখে।

২৪/৩/২০০৬ইং শুক্রবার দিবাগত রাত্রি ৪/১৪/৩ সে. পর্যন্ত দশমী ছিল। তারপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন রবিবার ২৫/৩/২০০৬ইং শনিবার দিবাগত রাত্রি ২/৩/৭ সে. পর্যন্ত ছিল। শনিবার প্রাতে সূর্যোদয় ৬/১১/১ সে. গতে ছিল। এই সময় থেকে ৪ দন্ড-অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায় শুক্রবার রাত্রি ৪/৩৫/১ সে.। একাদশী এই সময়ের পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তাই এটা দশমী বিদ্ধা ছিলনা। এই তথ্যের আলোকে সম্ভবতঃ গৌড়ীয় মঠ শনিবার ২৫/৩/২০০৬ইং তারিখে একাদশীর দিন নির্ধারণ করে। এই নির্ধারণ স্মার্ত্ত মতের সাথে মিলে যায়। - **(দ্রষ্টব্য ঃ নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ বাংলা পৃষ্ঠা ৪৪১ দেখুন)**

ইস্‌কন ২৬.০৩.২০০৬ ইং তারিখ রবিবার একাদশীর দিন নির্ধারণ করে। এর হেতু কি ? শ্রী হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী যদি একাদশী এবং দ্বাদশী শ্রবণ নক্ষত্র স্পর্শ করে তবে ঐদিন একাদশী না হয়ে দ্বাদশীর দিন একাদশী হবে। ২৫.০৩.২০০৬ ইং তারিখ শনিবার একাদশীর ৫১/৩/০৭ দন্ডব্যাপী হয়ে রাত্রি ২/৩/৭ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এর পর দ্বাদশী আরম্ভ হয়। শ্রবণ নক্ষত্র ঐদিন ৫১/৩/৩৭ দন্ডব্যাপী হয়ে রাত্রি ২/৩৬/২৮ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই জন্য ইস্‌কন চার্টে একাদশী শনিবার নির্ধারণ না করে রবিবার নির্ধারণ করা হয়েছে যা সঠিক। গৌড়ীয় মঠ শুধু অরুণোদয় অথবা দশমী বিদ্ধার উপরে গুরুত্ব দিয়েছে। নক্ষত্রের উপর গুরুত্ব দেয়নি। এই কারণে ইস্‌কন এবং গৌড়ীয় মঠের একাদশীর তারিখ নির্ধারণ দু'রকমের হয়েছে। **(চলবে)**

যত নগরাদী গ্রামে

২০০৭ এর ভয়াবহ বন্যায় ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ

ভগবানের সেবার আনুকুল্যে ইস্‌কনের ভক্তবৃন্দের বিপুল পরিমাণ আর্থিক সঞ্চয় থেকে সাম্প্রতিক বন্যা কবলিত আর্তত্রানে কতখানি দ্রুততা সহকারে দিকে দিকে সুষ্ঠ পরিকল্পিত ধারায় ইস্‌কনের **'ফুড ফর লাইফ'** প্রোগ্রামে ইস্‌কন ভক্ত মন্ডলী জীবনদায়ী ত্রানসামগ্রী বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করেছেন। তার এক আনুপূর্বিক পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

ঢাকা শহরস্থিত - টিকাটুলী, মালিবাগ, দয়াগঞ্জ, মাদারটেক, বৌদ্ধ মন্দির, বাসাবো, সদরঘাট, বান্দুরা।

এছাড়া সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ। বিতরণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল - খিচুরী প্রসাদ, চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ি, গুড়, খাবার স্যালাইন, ঔষধপত্র, মোমবাতি, দেশলাই ইত্যাদি।

সর্বত্র অভাবী নিরন্ন মানুষের ক্ষুধা মুছে দিতে পৃথিবী থেকে অনাহার দূর করতে ইস্‌কনের বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে সুস্বাদু কৃষ্ণ প্রসাদ বিতরণ চলছে। তারই অংশ হিসাবে বাংলাদেশেও এই প্রকল্পে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করা হচ্ছে। আপনিও **ইস্‌কন 'ফুড ফর লাইফ'** জীবনদায়ী কৃষ্ণ প্রসাদ বিতরণ কার্যক্রমে এগিয়ে আসুন। হরেকৃষ্ণ।

বাংলাদেশে বিশ্ব হরিনাম দিবস পালন ২০০৭

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) বিবিধ অনুষ্ঠান মালার মধ্য দিয়ে বিশ্ব হরিনাম দিবস পালন করে। ইস্‌কনের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনসমূহ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালন করেছে।

১৯৬৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যুগধর্ম হরিনাম প্রচার করার জন্য পাশ্চাত্যে (আমেরিকায়) পদার্পণ করেন। পরবর্তীসময়ে তিনি এই হরিনাম আন্দোলন সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল উদয়স্ত হরিনাম সংকীর্তন, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, বৈদিক চলচ্চিত্র ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। সংকীর্তন শোভাযাত্রাটি স্বামীবাগ আশ্রম থেকে বের হয়ে ওয়ারী, লক্ষ্মীবাজার, তাঁতীবাজার, শাঁখারী বাজার,ইংলিশ রোড, টিপু সুলতান রোড, সূত্রাপুর, টিকাটুলি মোড় প্রদক্ষিণ করে। হরিনাম দিবস উপলক্ষে ইস্‌কন স্বামীবাগ আশ্রম, বাংলাদেশের অধ্যক্ষ শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর উপস্থিতিতে স্বামীবাগ আশ্রমে (ইস্‌কন মন্দির) এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন শ্রী গৌর কিশোর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী অভয় কৃষ্ণ দাস, শ্রী পরম করুণা গৌর দাস ব্রহ্মচারী, বৃহৎভানু দাস, বনমালী চৈতন্য দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের র

থযাত্রা উৎসব - ২০০৭

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক- ২০০৭

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা- ২০০৭

শ্রীমতি রাধাঠাকুরাণীর অভিষেক- ২০০৭

শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা- ২০০৭

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী- ২০০৭

শ্রীমতি রাধাঠাকুরাণীর রাধাষ্টমী অনুষ্ঠান- ২০০৭

শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা- ২০০৭

বিশ্ব হরিনাম দিবস- ২০০৭

বিশ্ব হরিনাম দিবস- ২০০৭

বন্যার্থদের মাঝে ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ-এর ত্রাণ বিতরণ

বন্যার্থদের মাঝে ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ-এর ত্রাণ বিতরণ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

বর্ণ, বর্ণসঙ্কর ও বৈধ বিবাহ প্রসঙ্গ

-শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

তৃতীয় পর্ব

"অসবর্ণ বিবাহের ফলে হয় বর্ণসঙ্কর। সেই বিবাহকারিদের হয় নরকে গমন। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির যোগ্যতা তাদের বিনষ্ট হয়। জলপিণ্ড লুপ্ত হওয়ায় পিতৃপুরুষেরা স্বর্গ হতে তাদের অভিশাপ প্রদান করেন।" উদ্ধৃতাংশটুকু বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি এবং মাসিক সমাজ দর্পণের বর্তমান সম্পাদক শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু বিবাহ' নামক গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ থেকে সংকলিত। প্রবন্ধটি লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী। সমাজ সংস্কার সমিতির মুখপত্র সমাজ দর্পণ শ্রাবণ -১৪০০ সংখ্যায় (১৯৯৩) সালে অসবর্ণ বিবাহবিরোধী এ প্রবন্ধটি প্রথম ছাপা হয়। তখন সচেতন পাঠকদের মধ্য থেকে অনেকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রবন্ধটির উল্লিখিত বক্তব্য সমাজ সংস্কার সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে ঘোরতর অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল বিধায় আমি নিজেও সমাজ দর্পণে এর বিরুদ্ধে দু'বার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে (১৯৯৫ সালে) সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীর "হিন্দু বিবাহ চুক্তি নয়- ব্রত" শীর্ষক প্রবন্ধটি তার 'হিন্দু বিবাহ' নামক গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে কেন নির্বাচন করলেন, তা আমার মতো অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়।

শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর সম্পাদিত 'হিন্দু বিবাহ' (প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থে সর্বমোট তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সরকার। তৃতীয় প্রবন্ধটি লিখেছেন সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি নিজে। কিন্তু কোন প্রবন্ধেই বর্ণের কোন সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণের সংজ্ঞা উল্লেখ ব্যতীত একটি সংস্কার সমিতির সভাপতি হিসেবে অসবর্ণ বিবাহের বিরোধিতা করা কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো সমীচীন কিনা? এ প্রচারণার প্রভাব কি বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথার উপর পড়ছে না ? সমাজ সংস্কারে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হলে এমন প্রচারণা কি চালানো যায়? এখানে বলা দরকার যে, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি তার সূচনালগ্নে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংবলিত যে প্রচারপত্র বিলি করতো, তাতে বর্ণবৈষম্য (বিদ্যমান জাতিভেদ) বিলোপ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রসারের বিষয়টা খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকতো। অসবর্ণ বিবাহে জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য এ প্রচারপত্র মাঝেমধ্যে সমাজ দর্পণেও প্রকাশ করা হতো। কিন্তু এখন আর তা করা হয় না। অন্যদিকে সমিতির মুখপত্র সমাজ দর্পণকেও এখন আর আগের মতো 'বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির 'মুখপত্র' হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে না। এর ফলে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে 'সমাজ সংস্কার' - তা কি গুরুত্বহীন হয়ে পড়লো না ? নাকি সংস্কারের কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় এ ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছেনা? এসব প্রশ্ন ও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সমিতি তার সূচনালগ্নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে পিছিয়ে এসেছে। তবে আমি বলতে পারি, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সংস্কারকদের সংস্কারমূলক কাজ থেকে পিছিয়ে আসার পরিণাম কখনোই শুভ হয় না। অতীতে সতীদাহ প্রথাসহ বেশ কিছু সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ এসব ক্ষেত্রে যথাসময়ে সচেতন কিংবা উদ্যোগী হলে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজন হতো না- সমস্যাগুলোর সু-সমাধান সম্ভব হতো আইন প্রণয়ন ছাড়াই। বিবাহ সংক্রান্ত উল্লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এবং শ্রী শিবশংকর চক্রবর্তীকে আমরা সবিনয়ে যে প্রশ্নটি করতে পারি তা হলো, " বৈধ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তান বর্ণসঙ্কর কিংবা সেই বিবাহকারীদের নরকে গমন হয়- এ তত্ত্ব তারা পেলেন কোথায়?" এ তত্ত্বের বাস্তবিকই কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তি বা প্রমাণ আছে কিনা? থাকলে তা তাদের অনতিবিলম্বে কোন প্রচার মাধ্যমে উপস্থাপন করা উচিত। আমার মতে, শাস্ত্রে 'বর্ণসঙ্কর' শব্দটি উল্লেখ থাকলেও তার প্রয়োগ স্পষ্টতই 'অবাঞ্ছিত সন্তান' অর্থে। বৈধ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তান কি কখনো বর্ণসঙ্কর হয় ? ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন, " দেশে দেশে কলত্রাণি।" এর মানে সব দেশেই স্ত্রী পাওয়া যায়। আর ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ.সি.ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "একজন যোগ্য পুরুষের কখনও পত্নীর অভাব হয় না। তিনি আমেরিকাতেই যান আর চীনেই যান- পাত্রী কিংবা তার অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে বিবাহ করতে পারেন। এতে ধর্মের দিক থেকে কোন বাধা নেই।" কিন্তু যারা নিজ সমাজের মধ্যে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের ক্ষেত্রেই নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছেন, তারা কিভাবে চীন কিংবা আমেরিকায় গিয়ে

একজন হিন্দুর বিবাহ করাকে সমর্থন করবেন? সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যারা তথাকথিত অসবর্ণ বিবাহের বিরোধিতা করছেন- তারা বর্ণের সংজ্ঞা ও সংখ্যা প্রকাশ করছেন না। হিন্দু সমাজে সৃষ্ট সম্প্রদায়কে কি শাস্ত্রীয় বর্ণ বলে চালিয়ে দেয়া যায় ? আমার মতে মোটেই নয়। কারণ এর সাথে যথাযথ যোগ্যতা ও মেধার কোন সম্পর্ক নেই; অধিকন্তু এর সংখ্যাও চার নয়- অনেক বেশি।

'বর্ণ' শব্দের একটি অর্থ রঙ(Colour); অন্যটি অক্ষর (Letter)। এর বাইরে বর্ণ শব্দের সর্বজনগ্রাহ্য কোন অর্থ বর্তমান বিশ্বে চালু আছে কিনা ? শাস্ত্রে থাকলে তা নিশ্চয়ই গুণবাচক কিংবা রূপক অর্থে। যেমন, আলো, শুদ্ধতা ও শ্বেতবর্ণ হচ্ছে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি। লোহিত বা রক্তবর্ণ হচ্ছে রজঃগুণের অভিব্যক্তি। অজ্ঞান, অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে তমোগুণের অভিব্যক্তি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে একটি ত্রিবর্ণা (লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং) অজার নাম উল্লেখ আছে। এর মাধ্যমে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে। গীতা ১৮/৪০/৪১ শ্লোকে আছে, 'পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যেও এমন প্রাণী বা বস্তু নেই যা প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ হতে মুক্ত। বর্ণসমূহ গুণানুসারেই বিভাজিত কিংবা সৃষ্টি হয়েছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ। -(গীতা ৪/১৩)'কাজেই একথা স্পষ্ট যে, প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ - এ ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে জীবজগতের মধ্যে যে স্তরভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই একসময় বর্ণভেদ বলে প্রচার করা হয়েছিল। সত্ত্বাদি গুণ বোঝাতে শ্বেতপীতাদি বর্ণ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ছিল। এজন্যই সত্ত্বাদিগুণবৈষম্যে মানবজাতির মধ্যে যে ভেদ রচিত হয় তা বর্ণভেদ হিসেবে অভিহিত হয়েছে। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে স্তরভেদের মূল বিষয়টা হলো গুণ ও যোগ্যতা কিংবা মেধা। তাই সমাজে যোগ্যতানুযায়ী স্তর বিন্যাস হবে; নাম তার যাই দেয়া হোক না কেন। যেমন বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী নামের যোগ্যতাভিত্তিক চারটি স্তরের অস্তিত্ব রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এরূপ স্তর তথা শ্রেণীবিন্যাস অন্যান্য দেশেও রয়েছে। ন্যায়বিচার, শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই এরূপ যোগ্যতাভিত্তিক স্তরবিন্যাস দরকার হয়। তবে সরকারি চাকরিজীবীরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন নানামুখী পরীক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে। কিন্তু সমাজের ভেতরে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়- তাতো সৃষ্টি হয়েছে জন্মসূত্রে কিংবা বংশানুক্রমিকভাবে। এর সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা পরীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। কোন কোন সংহিতায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি স ব্রাহ্মণঃ) জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। এজন্য প্রথমত দরকার যোগ্যতা - দ্বিতীয়ত সংস্কারের প্রয়োজন হয়। এর সমর্থন পবিত্র গীতায় রয়েছে, মহাভারতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে রয়েছে। সুতরাং সমাজে জন্মসূত্রে যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, তা কখনো বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। বর্ণ ও সম্প্রদায়কে কোন অবস্থায়ই গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। সম্প্রদায়কে ইংরেজিতে বলা হয় 'Caste'। ইংরেজি 'Caste' শব্দটির উদ্ভব শব্দ 'Casta' থেকে। ভারতবর্ষে 'কস্টা' শব্দটি আমদানি ঘটে পর্তুগীজ নাবিকদের মাধ্যমে। শব্দটির প্রয়োগ জ্ঞাতি - গোষ্ঠী কিংবা একই রীতি-নীতি অনুসরণকারী জনগোষ্ঠী অর্থে। তাই বর্তমানকালের সম্প্রদায় কিংবা 'Caste'কখনোই শাস্ত্রীয় বর্ণের সমার্থক হতে পারে না। যারা বর্ণের প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা পাশ কাটিয়ে একই অর্থে প্রয়োগ করছেন তারা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে আসলে গতানুগতিক গোষ্ঠীস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ কাজ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই এটা মানা যায় না।

যে কোন সমস্যার সমাধানের সূত্র খোঁজা দরকার যথাযথ ধর্ম, বাস্তব অবস্থা, আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদের মাধ্যমে বর্ণবাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। ২১মার্চ আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্যবিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় ভারত-বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই প্রতি বছর এ দিনটি পালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। ভারতের সংবিধানে বর্ণবৈষম্য মানা কিংবা প্রশ্রয় দেওয়াকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বর্ণপ্রথা বিলোপ করা না করার বিষয়টা এর আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্যে ও আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য ও জন্মগত তথা বংশগত। হিন্দু সমাজের চলমান বর্ণপ্রথার ভিত্তি কি এ থেকে ব্যতিক্রম বলে মনে করা যায় ? শরীরের রঙের ক্ষেত্রে না হলেও তো বিষয়টা জন্মগত তথা বংশগত দেখা যায়। কোন ব্যতিক্রমই তো পরিলক্ষিত হয় না। আর ব্যতিক্রম নয় বলেইতো তা বিদেশীদের কাছে তা আপত্তিকর বলে মনে হয় এ প্রসঙ্গে এখানে সম্মানিত এবং সুধী পাঠকমণ্ডলীর অবগতির জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ফরাসী ভদ্র মহিলার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা যায়। গত ১৯৯৫-এর জুনে স্বাধীন ভারতের মহান স্থপতি ও অহিংসবাদীনেতা মহাত্মা গান্ধীর ১২৫তম জন্মদিন স্মরণে তাঁর নীতি ও ওই দর্শনের ওপর জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল।

(চলবে)

বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধতা

-স্বামী ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

আমি সমস্ত বৈষ্ণবগণকে আমার দন্ডবৎ প্রণাম জানাই। এই পত্রিকার সমস্ত পাঠকমণ্ডলীকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই। বৈষ্ণবদের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিকে একটি উচ্চ ধারণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে- প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বিশেষভাবে এখন ভারতের জনসাধারণের কাছে ইস্কন বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে, সমগ্র জাতিকে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করার জন্য।

শ্রীল প্রভুপাদের এই শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমি যে সমস্ত সম্মানীয় পাঠকগণের কাছে যেতে পেরেছি, সেটা আমার কাছে অত্যন্ত মঙ্গলজনক ঘটনা। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা এবং আশীর্বাদের ফলে আমি ভারতে এবং বিদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিস্তার এবং তাকে বর্ধিত হতে দেখেছি। তিনি নিজে বহুবার আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন যাতে করে আমি সরাসরিভাবে তাঁর দূরদৃষ্টির প্রকাশ দেখতে পাই। কিন্তু আমি আমার গুরুদেব, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামীর কাছে আমার সেবার জন্য তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারিনি। পরে তাঁদের কৃপায়, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্যবর্গের ইচ্ছায়, আমার গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় এবং কৃপায় আমার বিদেশে যাবার সুযোগ হয়েছিল, এখন থেকে কয়েক বছর পূর্বে। তখন আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ব প্রকাশ হতে দেখি। আসলে তখন আমি দেখলাম যে, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অহঙ্কারপূর্ণ পর্বত থেকে একটা সুন্দর পথ তৈরী করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রতিষ্ঠা করেছেন; যাতে করে আমরা সেই জগতে প্রবেশ করতে পারবো।

ইস্কনের দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ক্রমবর্ধিত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার আমাকে খুব উৎসাহিত করে এবং এর ভবিষ্যৎ প্রসার সম্পর্কে আনন্দিত করে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং বিভিন্ন ধরনের প্রচার পদ্ধতি সত্ত্বেও আমাদের সকলেরই একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী - "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম"- সার্থক করা।

এটা খুবই সত্যি যে, আমাদের প্রত্যেকের প্রচার করার ক্ষমতা ও পদ্ধতি একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি আমরা সকলে নিষ্ঠা সহকারে একসঙ্গে কাজ করি, তা হলেই এটা সম্ভব হবে। এটা আমাদের আলাদা আলাদা মিশনের জন্য যদি না করতে পারি তা হলে অন্তত শ্রীল প্রভুপাদ, যিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রধান সেনাপতি, তাঁর উদ্দেশ্যে করা খুবই দরকার। শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল গুরুমহারাজ এটা করে দেখিয়েছেন যখন থেকে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, আজ যদি আমাদের সন্মুখে তাঁরা দু'জন প্রকাশিত হন, তখন তাঁরা আমাদের কাছে সকলে মিলেমিশে ভ্রাতৃভাব বজায় রেখে প্রচারের দাবী করবেন। এই সুন্দর পদ্ধতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে এই শ্লোকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন,

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানীনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি।

"যে নিজেকে ঘাসের (তৃণের) থেকে ছোট এবং বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু মনে করবে, এবং যে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করবে, নিজের মান-সম্মান চাইবে না, সে-ই একমাত্র হরিকীর্তন করার যোগ্য।"

সুতরাং, আমাদের অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীল গুরুমহারাজ এবং শ্রীল প্রভুপাদের ,উল্লেখিত নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করা উচিত।

আমি শুধু আমার গুরুমহারাজেরই সেবা করি, তাই নয়। তাঁর নির্দেশমতো আমার আধ্যাত্মিক সেবাকর্ম করি, তাই নয়। আমি শ্রীল প্রভুপাদেরও ছাত্র ছিলাম এবং তাঁর কাছেও অনেক কিছু শিখেছি। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ করি। যেমন- যত পারছি গ্রন্থ ছাপানোর চেষ্টা করছি। আমার বলতে গর্ববোধ হচ্ছে যে, আমাদের এখন বিভিন্ন ভাষায় ২০০ (দু'শ) -এর অধিক গ্রন্থ ছাপানো হয়েছে।

আমি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সকলের জন্য অপেক্ষা করছি তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যারা আমার কাছে কোনও সেবার ব্যাপারে আসতে চায়। আমি সব সময় আমার শিষ্য, গুরুভ্রাতা এবং বন্ধুদের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তারা সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে, বিশেষ করে বৈষ্ণবগণকে এবং যে কোনো ধর্মীয় সংস্থাকে যারা বৈষ্ণবীয় দর্শন প্রচারের চেষ্টা করছে। যে কোনও উপায়ে আমি যদি যে কোন সংস্থার সেবারত প্রচারককে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি তা হলে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা করব। যারা আমাদের গুরুমহারাজদের নির্দেশ পালন করে, তাঁদের অভিলাষ পূরণ করতে ইচ্ছুক তারা যেন একসঙ্গে থেকে ভ্রাতৃভাব বজায় রেখে কাজ করার চেষ্টা করে দেখে যে কতটা সম্ভব হচ্ছে। এটা সত্যি

যে সমাজের নিয়ম মানুষকে সম্পূর্ণ শান্তি দিতে পারে না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে একজন সত্যিকারের বৈষ্ণব সব সময় সমন্বয়পূর্ণ সেবার কাছে অবস্থিত। কাজেই তার কাছে সকলের সঙ্গে সমন্বয় রাখা খুবই সহজ। বৈষ্ণবের গুণ হচ্ছে দীনতা, সহিষ্ণুতা এবং অপরকে সম্মান দেওয়া, তাই সেই বৈষ্ণবের কেউ-ই শত্রু থাকতে পারে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, বৈষ্ণবগণ হচ্ছেন সত্যিকারের হৃদয়ের বন্ধু কেননা তাঁদের হৃদয় সত্যিকারের সুন্দর। সুতরাং আমি ইচ্ছা করি যে, ভালবাসা, সকলকে সম্মান দেওয়া এবং বোঝাপড়া, দীনতা, সহিষ্ণুতা আমাদের যেন অভিজ্ঞান হয় যেটা আমরা গর্বের সঙ্গে ধারণ করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করব।

এই আমার আন্তরিক এবং অকৃত্রিম অভিলাষ নিয়ে আর একবার সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে সকলের ক্ষুদ্র সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার অভিপ্রায় নিয়ে শেষ করছি।

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

কাউকে উদ্যোগী হতে দেখা যায় না- এটি নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

জন্মাষ্টমীর দিনটিতে সারা ভারত-বাংলাদেশে সাধারণ ছুটির দিনরূপে ঘোষিত হয়। ছুটির আনন্দে সকলে ঐ দিনটি অবহেলায় কাটায়। কিন্তু ঐদিন সকাল থেকে মহামহোৎসবের আয়োজন ক'টা বাড়িতেই বা দেখা যায়? এর কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তথা আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা।

এই অজ্ঞতা দূর করা একটা সাংস্কৃতিক প্রয়োজন। খ্রিস্টের জন্মোৎসবে সমগ্র পৃথিবী যেভাবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কৃষ্ণের আবির্ভাবের দিনে ভারতবাসীও তেমনভাবে মেতে ওঠে না, এটা ভারতীয় সংস্কৃতিবান নেতৃত্বেরই দৈন্য। তাঁরা হেনতেন বহুজনের জন্মোৎসবে জনগণকে নানাভাবে আকৃষ্ট করেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ভারতীয় ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির কেন্দ্রাতিত পরম শক্তি, তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতি জনমানস আকৃষ্ট করা প্রয়োজন মনে করেন না।

অথচ গীতামাহাত্ম্যের সপ্তম শ্লোকে রয়েছে- একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্ একো দেবো দেবকীপুত্র এব- বর্তমান জগতে মানুষ আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে একটা শাস্ত্রের, একক ভগবানের— সারা পৃথিবীতে মানুষের জন্য সেই একক শাস্ত্র হোন ভগবদ্গীতা এবং সমস্ত বিশ্ব চরাচরের একক ভগবান হোন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

জন্মাষ্টমীর প্রাক্কালে এবং পরদিন নন্দোৎসবে দেশের ঘরে ঘরে পল্লীতে পল্লীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলে ছোট-বড় সকলেই এই তাৎপর্য ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

শ্লোক ১৬

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥১৬॥

ধ্যায়ত ঃ- এইভাবে ধ্যান করে; চরণাম্ভোজম্ - পরমাত্মার চরণকমল; ভাব-নির্জিত- ভগবৎ-প্রীতির ভাবে আপ্লুত চিত্ত; চেতনা - সমস্ত চেতনা (চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা); ঔৎকণ্ঠ্যা- উৎকণ্ঠা; অশ্রু-কল- অশ্রু বর্ষিত হয়েছিল; অক্ষস্য- চোখের; হৃদি- আমার হৃদয়ান্তরে; আসীৎ- আবির্ভূত হয়েছিলেন; মে- আমার; শনৈঃ - অচিরে; হরিঃ- পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে 'ভাব' কথাটি অত্যন্ত- তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত অনুরাগের ফলে 'ভাব' প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তরটি হচ্ছে শ্রদ্ধা এবং ভগবানের প্রতি এই শ্রদ্ধা বর্ধিত করার জন্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করতে হয়; সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিধান অনুসারে ভগবানের ভজন করা। এই ভজনক্রিয়ার ফলে সব রকমের অনর্থ নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সব রকমের জড় আসক্তির নিবৃত্তি হয় এবং ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায়। অনর্থ নিবৃত্তির পর পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠার উদয় হয়, এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রতি রুচি বর্ধিত হয়। তার থেকে আসক্তির উদয় হয় এবং তারপর ভাবের উদয় হয়। এই ভাব হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রাথমিক স্তর। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত-স্তরগুলি হচ্ছে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তর। এইভাবে ভগবৎ প্রেমের দ্বার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে গভীর বিরহের অনুভূতির উদয় হয় এবং তা থেকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়; ভক্তের চোখ দিয়ে যে অশ্রু ঝরে পড়ে তা ভগবৎ-প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং যেহেতু শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজীবনে গৃহত্যাগ করার পর অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তির এই অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার ফলে তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত, চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১৭

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসম্প্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥১৭॥

প্রেমা- প্রেম; অতিভর- অত্যন্ত; নির্ভিন্ন- বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; পুলক- আনন্দানুভূতি; অঙ্গঃ - দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; অতিনির্বৃতঃ - সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে। আনন্দ- আনন্দ; সম্প্লবে- আনন্দের সমুদ্রে; লীনঃ- লীন; ন- না; অপশ্যম্ - দেখতে পেরেছিলাম; উভয়ম্ - উভয়কে; মুনে - হে ব্যাসদেব।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না।

তাৎপর্য

চিন্ময় সুখানুভূতি এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে জড়জাগতিক কোন কিছুর তুলনা করা চলে না। তাই এই ধরনের অনুভূতির যথাযথ বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীনারদ

মুনির বর্ণনায় এই ধরনের আনন্দানুভূতির একটু আভাস আমরা পাচ্ছি। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ কার্য রয়েছে।

ভগবানকে দর্শন করার পর প্রতিটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে উঠে, কেন না মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয়। দিব্য আনন্দে ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবা করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তার ফলে নারদ মুনি একই সঙ্গে তাঁর স্বরূপ দর্শন করে এবং ভগবানকে দর্শন করে আত্মহারা হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্মনা ইব ॥১৮॥

রূপম– রূপ; ভগবতঃ– পরমেশ্বর ভগবানের; যৎ– যথাযথ; তৎ– তা; মনঃ – মনের; কান্তম্ – বাসনা অনুসারে; শুচাপহম্ – সমস্ত প্রভেদ দূর করে। অপশ্যন্ – দর্শন না করে; সহসা – সহসা; উত্তস্থে – উঠে দাঁড়িয়ে; বৈক্লব্যাৎ – বিচলিত হয়ে; দুর্মনা – আকাঙ্খিতকে হারিয়ে; ইব – যেমন।

অনুবাদ

ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত- প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবান যে নিরাকার নন তা নারদ মুনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রূপ আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জড় রূপের থেকে ভিন্ন। আমাদের জীবদ্দশায় আমরা জড় জগতে বিভিন্ন রূপ দর্শন করে থাকি, কিন্তু তাদের কোনটিই আমাদের চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে না এবং মনের সব রকম চঞ্চলতাও দূর করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সেই রূপ একবার দর্শন করলে আর অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে না; এই জড় জগতের কোনও রূপ তখন তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। শাস্ত্রে যে ভগবানকে অনেক সময় অ-রূপ বা নিরাকার বলা হয়, তার অর্থ হচ্ছে যে তাঁর রূপ জড় নয়।

আমরা সকলেই হচ্ছি চিন্ময় জীব, তাই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত হয়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের সেই রূপের অনুসন্ধান করছি এবং জড় জগতের অন্য কোনও রূপ দর্শন করে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। নারদ মুনি ক্ষণিকের জন্য সেই রূপ দর্শন করেছিলেন এবং সেই রূপ পুণরায় দর্শন না করতে পেরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সেই রূপের অন্বেষণ করার জন্য তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে যা আকাঙ্খা করছি নারদ মুনি তা পেয়েছিলেন এবং তাঁকে পুনরায় দর্শন করতে না পেরে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোঽপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥১৯॥

দিদৃক্ষুঃ – দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে; তৎ – তা; অহম্ – আমি; ভূয়ঃ – পুনরায়; প্রণিধায় – মনকে একাগ্র করে; মনঃ – মন; হৃদি – হৃদয়ে; বীক্ষমাণঃ – দর্শন করার প্রতীক্ষায়; অপি– তা সত্ত্বেও; ন – না; অপশ্যম – দেখতে না পেয়ে; অবিতৃপ্তঃ – অতৃপ্ত; ইব – মতন; আতুরঃ – আতুর।

অনুবাদ

আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ আবার দর্শন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পুণরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে আমি আর দেখতে পাইনি এবং এইভাবে অতৃপ্ত হয়ে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম।

তাৎপর্য

কোন রকম কৃত্রিম যৌগিক পন্থার দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না। তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর। আমাদের ইচ্ছামত আমরা যেমন সূর্যের উদয় দাবি করতে পারি না, ঠিক তেমনই আমাদের ইচ্ছামত আমরা আমাদের সম্মুখে ভগবানের উপস্থিতিও দাবি করতে পারি না। সূর্য তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে উদিত হন; তেমনই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে যখন আমাদের দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁকে দর্শন করা যায়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করে যাওয়া। নারদ মুনি মনে করেছিলেন যে, যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি পুনরায় ভগবানকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন, যেভাবে তিনি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁর দর্শন

পেয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি আর ভগাবনের দর্শন পেলেন না। ভগবান হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করে, তখন তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে তাঁকে দর্শন দান করতে পারেন।

শ্লোক ২০

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্।
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥২০॥

এবম্ – এইভাবে; যতন্তম্– চেষ্টাপরায়ণ; বিজনে – সেই নির্জন স্থানে; মাম্– আমাকে; আহ– বলেছিলেন; অগোচরঃ – জড় শব্দের অতীত; গিরাম্ – বাণী; গম্ভীর – গম্ভীর; শ্লক্ষ্ণয়া – শ্রুতিমধুর; বাচা – বাণী; শুচঃ – অনুশোচনা; প্রশময়ন– উপশম; ইব– মতো।

অনুবাদ

সেই নির্জন স্থানে আমার প্রচেষ্টা দর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে আমার অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য কথা বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে ভগবান প্রাকৃত বাণী এবং বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তবুও তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে কেউ যখন উপযুক্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তার বাণী শুনতে পান অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। ভগবান যা'কে কৃপা করেন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান। ভগবান নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁকে উপযুক্ত শক্তি দান করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর কথা শুনতে পান। বৈধী ভক্তির স্তরে অন্য কারও পক্ষে কিন্তু সরাসরিভাবে ভগবানের সংস্পর্শ অনুভব করা সম্ভব নয়। নারদ মুনি যখন ভগবানের মধুর বাণী শুনতে পান, তখন তাঁর বিরহ-বেদনা কিয়দংশ উপশম হয়েছিল। ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের বিরহ-বেদনা অনুভব করেন এবং তাই তিনি সর্বদাই দিব্য আনন্দে অভিভূত থাকেন।

শ্লোক-২১

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিনাম্ ॥২১॥

হন্ত-হে নারদ; অস্মিন্-এই' জন্মনি-আয়ুষ্কালে; ভবান্-তুমি; মা-না; মাম্-আমাকে; দ্রষ্টুম্-দর্শন করতে; ইহ-এখানে; অর্হতি-যোগ্যতা; অবিপক্ক-অপরিণত; কষায়াণাম্-জড় কলুষ; দুর্দর্শঃ-দর্শন করা কঠিন; অহম্-আমি; কুযোগিনাম্-যার সেবা পূর্ণ হয়নি।

অনুবাদ

(ভগবান বললেন) হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ ঃ দর্শন করতে পারেনা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র, পরম পুরুষ এবং পরমতত্ত্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে একটুও জড় কলুষ নেই এবং তাই যদি কারো মধ্যে অল্প একটুও জড় আসক্তি থাকে, তা হলে তিনি ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে পারেন না। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তত দুটি গুণ, অর্থাৎ রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন তখনই ভগদ্ভক্তি শুরু হয়। সেই দুটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে কাম এবং লোভ থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের লোভ থেকে মুক্ত হতে হবে। সত্ত্বগুণ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের সমতা। সব রকমের জড় প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়া। নির্জন অরণ্যে ভগবানের ধ্যান করা হচ্ছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। কেউ বনে গিয়ে পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন। সব রকমের জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসা যায়। সে জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সেই স্থানে বাস করা, যেখানে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা হয়। ভগবানের মন্দির হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত, কিন্তু বনে গিয়ে ধ্যান করাটা হচ্ছে সাত্ত্বিক ক্রিয়া। তাই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে বনে গিয়ে ভগবানকে না খুঁজে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনা করতে সর্বদা নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় অর্চনা থেকে, যা বনে গিয়ে ভগবানকে খোঁজার চেয়ে অনেক উন্নত। নারদ মুনি বর্তমান জীবনে বনে যাননি, কেন না এই জীবনে তিনি সব রকমের জড় আকাঙ্খা

থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন; তিনি তাঁর উপস্থিতির প্রভাবে যে কোনও জায়গাকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারতেন। তিনি এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে গিয়ে মানুষ দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, ঋষি, মুনি এবং অন্য সকলকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন। তাঁর কৃপার প্রভাবে তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ আদি বহু ভক্তকে ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত করেছিলেন।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই নারদ মুনি, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ মহান ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। ভগবানের এই মহিমা প্রচার হচ্ছে সব রকমের জড় গুণের অতীত চিন্ময় ক্রিয়া।

শ্লোক-২২

সকৃদ্‌যদ্ দর্শিতং রূপমেতৎকামায় তেহনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥২২॥

সকৃৎ-একবার মাত্র; যৎ--যে; দর্শিতম্-দেখানো হয়েছিল; রূপম্-রূপ; এতৎ-এই; কামায়-তীব্র লালসা; তে-তোমায়; অনঘ-হে নিষ্পাপ; মৎ-আমার; কামঃ-কামনা; শনকৈঃ-বুদ্ধির দ্বারা; সাধুঃ-ভক্ত; সর্বান্-সমস্ত; মুঞ্চতি-মোচন করে; হৃচ্ছয়ান্-জড় কামনা-বাসনা।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য; কেন না তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

জীব কখনও বাসনারহিত হতে পারে না। সে একটি প্রাণহীন পাথর নয়। কর্ম করা, চিন্তা করা, অনুভব করা এবং ইচ্ছা করা হচ্ছে তার স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু সে যখন জড় বিষয়ে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছা করে, তখন সে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, সে যখন ভগবানের সেবার কথা চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং ইচ্ছা করে, তখন সে ধীরে ধীরে সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। জীব যতই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়, ততই তাঁর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সেটিই হচ্ছে ভগবৎ-সেবার অপ্রাকৃত গুণ। সাধারণত জড় কর্মে বিরক্তি আসে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় কোন রকমের বিরক্তি নেই অথবা তার অন্ত নেই। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে পারে এবং তবুও তাতে বিরক্তি আসে না বা তার সমাপ্তি হয় না। ঐকান্তিক ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তাই ভগবানকে দর্শন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া, কেননা তাঁর সেবা এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করে যাওয়া।

ভগবান তখন কিভাবে সেই সেবা সম্পাদন করতে হবে এবং কোথায় তা সম্পাদন করতে হবে তার নির্দেশ প্রদান করেন। নারদ মুনির কোন জড় বাসনা ছিল না, কেবল ভগবানের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান তাঁকে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক-২৩

সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥২৩॥

সৎসেবয়া-ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবার দ্বারা; অদীর্ঘয়া-অল্পকালের জন্য; অপি- এমন কি; জাতা-লাভ হয়; ময়ি-আমার প্রতি; দৃঢ়া-দৃঢ়; মতিঃ-মতি; হিত্বা-বর্জন করে; অবদ্যম্- দুঃখদায়ক; ইমম্-এই; লোকম্-জড় জগৎ; গন্তা- যায়; মজ্জনতাম্-আমার পার্ষদ; অসি-হয়।

অনুবাদ

অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবা করা হয়, তা হলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের সেবা করার অর্থ হচ্ছে সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা। সদ্গুরু হচ্ছেন কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যম। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার সামর্থ্য নেই এবং তাই সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁকে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার শিক্ষালাভ করতে হয়। এই শিক্ষার প্রভাবে স্বল্পকালের জন্য হলেও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত এই ধরনের অপ্রাকৃত সেবায় মতিসম্পন্ন হন, যা তাঁকে চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং চিন্ময় জগতে উন্নীত হয়ে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করতে সাহায্য করে।

চলবে

"কৃষ্ণ" আনন্দের আধার

এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত

KIRSHNA-THE RESERVOIR OF PLEASURE গ্রন্থ থেকে অনুদিত

অনুবাদক- মীনাক্ষী রাধিকা দেবী দাসী

(প্রথম প্রকাশের পর)

কারণ 'ভগবদ্‌গীতা' বলা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কিছু লোক জিজ্ঞাসা করে থাকে– এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের সাথে আমাদের কি করার আছে। কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্রের সাথেই আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু আমরা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্তরে রয়েছি তখন কেন এই যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করব-কারণ কৃষ্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন এবং এই কারণেই সমগ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রটি কৃষ্ণময় হয়েছিল। যেমন, ধরা যাক যে-বিদ্যুৎ প্রবাহ যখন কোনো বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সমগ্র বস্তুটিই বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বৈদ্যুতিক বস্তুতে পরিণত হয়। ঠিক তেমনই কৃষ্ণ যখন কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন তখন সেই বিষয়টিইও কৃষ্ণায়িত হয়ে যায়। অন্যথায় এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনই আমাদের থাকে না। এটাই তাঁর সর্বশক্তিমত্তা। শ্রীমদ্‌ভাগবতমেও এই শক্তিমত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাগবতে অনেক কৃষ্ণ কথা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যগুলো এসবে পূর্ণ। বেদের অন্তর্গত ধর্মশাস্ত্রগুলো বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু এদের সবগুলোই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকথা। যদি আমরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে এ সকল কথা সহজভাবে শ্রবণ করি তাহলে ফলাফলটা কি হবে? এটা একটা শুদ্ধ অপ্রাকৃত কম্পন এবং এর ফলটা হবে ধর্মীয় চেতনা বা পারমার্থিক ভাবনা।

বহু বহু জন্মের সময় জাগতিক দূষণের কারণে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আমরা অনেক অমঙ্গলজনক বস্তু বা দূষিত পদার্থ জমা করে থাকি। শুধুমাত্র এই জন্মে নয়-অনেক অনেক জন্মের ফলে এটা হয়। সুতরাং যখন আমরা কৃষ্ণ কথা দ্বারা আমাদের হৃদয়কে অন্বেষণ করি, তখন এই দূষণ যা আমরা জমা করেছিলাম তা বিধৌত হয়ে যায়। আমাদের হৃদয় সকল আবর্জনা হতে পরিষ্কার হয় এবং যেই মাত্র সকল ময়লা দূরীভূত হয়ে যায়, তখন আমরা শুদ্ধ চেতনায় অবস্থান করি। সকল মিথ্যা উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া বা এর মূলোৎপাটন করা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই খুবই কষ্টকর। উদাহরণস্বরূপ আমি হচ্ছি ভারতীয়, খুব শীঘ্রই এটা চিন্তা করা সম্ভব নয় যে আমি ভারতীয় নই-আমি হচ্ছি শুদ্ধ আত্মা। একইভাবে কারো দেহগত উপাধির সাথে সম্পর্কিত পরিচয় থেকে মুক্ত হওয়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখন যদি আমরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে থাকি, তখন এই কাজটা খুব সহজ হয়ে যাবে। একটি পরীক্ষণ চালিয়ে দেখা যেতে পারে, যে কিভাবে তোমরা তোমাদের সকল উপাধি থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হতে পার। অবশ্য এটা ঠিক, হঠাৎ করে সকল ময়লা আবর্জনা থেকে মনকে পরিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। তবে আমরা শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারব যে, জড়া প্রকৃতির প্রভাব শিথিল হয়ে আসছে।

জড়া প্রকৃতি তিন ভাবে কাজ করে থাকে। শুদ্ধ অবস্থা বা শুদ্ধ আচরণ (সত্ত্বগুণ) আসক্তি (রজগুণ), এবং অজ্ঞানতা (তমোগুণ)। অজ্ঞানতা হচ্ছে আশাহীন জীবন। আসক্তি বা ভাবাবেগটা হচ্ছে জড়বাদ সম্বন্ধীয়। কেউ যদি এই আসক্তি বা জাগতিক উত্তেজনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে সে এই জড় অস্তিত্বের অনিত্য সুখ ভোগ করতে চায়। কারণ সে প্রকৃত সত্যটা জানে না, সে শুধু তার দেহের শক্তি ক্ষয় করার মাধ্যমে বিষয়টিকে ভোগ করতে চায়। এটাকেই বলা হয় আবেগীয় অবস্থা। আর অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে কোনো আসক্তি বা আবেগও নেই আবার শুদ্ধ আচরণও নেই। তারা জীবনের গভীরতম অন্ধকারে অবস্থান করে। সত্ত্বগুণে অবস্থান করে আমরা অন্তত তাত্ত্বিকভাবে এটা বুঝতে পারি যে-আমি কে, এই পৃথিবী কি, ভগবান কে এবং ভগবানের সাথে আমাদের সম্পর্কই বা কি? এটাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা বা সত্ত্বগুণ। কৃষ্ণকথা শ্রবণের মাধ্যমে আমরা এই অজ্ঞানতা ও উত্তেজনার স্তর থেকে মুক্ত হতে পারি। আমরা তখন সত্ত্বগুণে অবস্থান করতে পারব। অন্ততঃপক্ষে আমাদের এই বাস্তব জ্ঞানটা থাকবে যে আমরা কে? অজ্ঞানতা বা তমোগুণ হচ্ছে, পাশবিক অস্তিত্বের মতো। পশুদের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা কিভাবে এই দুর্দশা ভোগ করছে। একটা শুকরের জীবনাচরণ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। (চলবে)

ছোটদের শ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোরক্ষাকে প্রভুপাদ সবচেয়ে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিশ্বময় তিনি অনেকগুলো গোশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

রুশ, চীন দেশীয় ভাষা ছাড়াও আজ পৃথিবীর ৫০টিরও বেশী ভাষায় ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট ছাপাচ্ছে। একমাত্র প্রভুপাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই কম্যুনিস্ট দেশগুলিতেও ইসকন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট স্থাপন করলেন। একবার কোন বাড়ীতে প্রভুপাদের গ্রন্থ পৌছলে, একদিন তা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করবে এবং স্থানীয় সকলকেই কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধ সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগ ভক্তিবেদান্ত ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞানীরাই বিশ্বে জড়বাদের জন্য মূলতঃ দায়ী বলে প্রভুপাদ জানালেন: এবং একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও যদি কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র জগৎ তার পথ অনুসরণ করবে বলে প্রভুপাদ অনুভব করলেন। উচ্চশিক্ষিত সকল মেধাবী ছাত্রদের তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত ইনষ্টিটিউট-এ যোগদান করতে অনুরোধ করলেন।
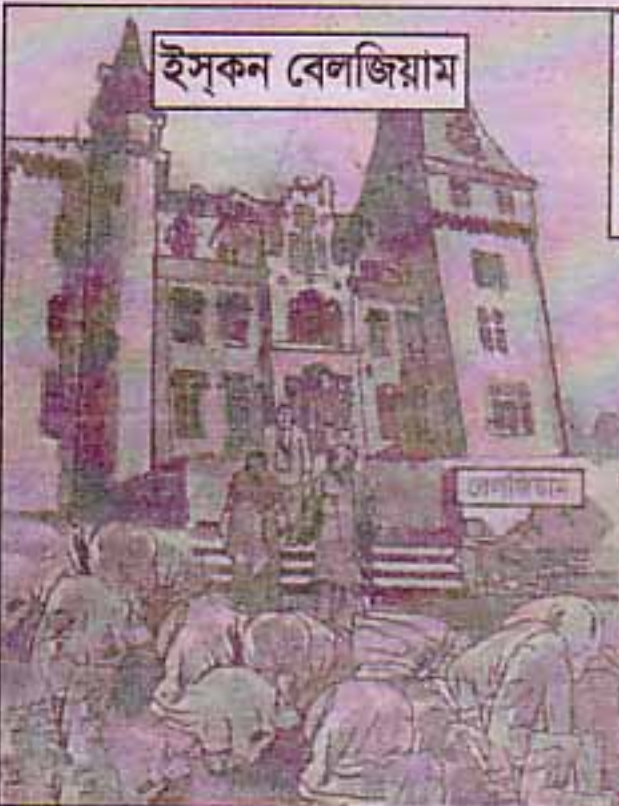
ভারতে তিনটি প্রধান প্রকল্প রূপায়ণে প্রভুপাদ স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেন ।

তখন তার শিষ্যরা নিয়মিত হরিনাম সংকীর্তন, রথযাত্রা মহোৎসব এবং বিভিন্ন স্থানে মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করতো ।
সংকীর্তন

কয়েক দশক আগে এক জোতিষী যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তা সর্বতোভাবে রূপায়িত হচ্ছে বলে আজ মনে হচ্ছে ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দির, আন্তর্জাতিক অতিথিশালা গুরুকূল, বৃন্দাবন ।
শ্রীশ্রীরাধা রাসবিহারী মন্দির, অতিথিশালা, বোম্বে ।
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির ও আন্তর্জাতিক অতিথিশালা ।

● ছোটদের শ্রীল প্রভুপাদ সমাপ্ত

উপদেশে উপাখ্যান

গণগড্ডলিকা

শ্রীচৈতন্যদেব তখন বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন। বহু লোক তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল, "কালীয় দহে কালীয় নাগের মাথায় মণি জ্বলছে, আর তার উপর কৃষ্ণ নাচছেন। এই অদ্ভুত ঘটনা আমরা সাক্ষাৎ দেখে এলাম। এতে কোনও সন্দেহ নেই।" এইভাবে তিন দিন ধরে বহু লোক মহাপ্রভুর কাছে এসে বলতে লাগল।

মহাপ্রভুর সেবক বলভদ্র ভট্টাচার্য ছিলেন সরল বুদ্ধি। তিনি কালীয় দহে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার ইচ্ছা করলেন। তখন তাঁর গালে মহাপ্রভু এক চড় কষে দিয়ে বললেন, "তুমি গণগড্ডলিকার কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ কেন? গণগড্ডলিকা কথার মোহে পড়ে অসত্যকে সত্য মনে করো না।" পরদিন সকালে একজন শিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হলে মহাপ্রভু তাঁর কাছে শুনতে পেলেন, রাতের বেলায় নৌকাতে চড়ে জেলেরা কালীয় দহে মাছ ধরে। দূর থেকে মূর্খরা তা দেখে নৌকাকে কালীয় নাগ ও তাদের আলোকে কালীয়ের মাথার মণি মনে করে, আর জেলেকে কৃষ্ণ মনে করে ভুল করেছে।

হিতোপদেশ

গণগড্ডলিকার দ্বারা কত কিছুই না 'ধর্ম' ও 'সত্য' বলে প্রচারিত হয়ে থাকে। কত কল্পিত অবতার, কত কল্পিত মহাপুরুষ ও মতবাদের প্রচার হয়ে লোককে বিপথগামী করেছে ও করছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃত সত্য-পিপাসু ব্যক্তি এরূপ গণগড্ডলিকা থেকে সতর্ক থাকবেন।

জীবনের সুখদুঃখ

ভাস্কর ও শশধর নামে দুই বন্ধু ছিল। ভাস্কর বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করত। সেই শাস্ত্রকথা বুঝবার জন্য তার খুব আগ্রহ ছিল। সে প্রায়ই বলত, "জানো শশধর, মানুষ - যার যে পরিমাণে সুখ বা দুঃখ পাওয়ার কথা তা সে পাবেই। এটাই বিধির বিধান। আমরা আমাদের কর্মের ফল মাত্র ভোগ করে থাকি। তবে হরিনাম করলে শ্রীহরি আমাদের সুমতি দিয়ে থাকেন। বুঝলে শশধর, হরিভক্তি বিনা কেউ কর্মচক্র থেকে নিস্তার পায় না।" শশধর এসব শাস্ত্রকথায় আগ্রহী ছিল না। সে যুক্তি দিয়ে বলত, "রোগীর রোগযাতনা ওষুধ খেলেই দূর হয়। মানুষ চেষ্টা করলেই তার দুখঃ দূর করতে পারে। এ কথা শুনে ভাস্কর বলেছিল "তবে তুমি কেন তোমার অসুস্থতার কথা বল, ওষুধ খেয়ে সুস্থ হও না কেন? শশধর উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, চেষ্টা করলেই সুস্থ হয়ে যাব। একদিন শশধরের বাড়িতে এক জ্যোতিষী আসেন। শশধর তাঁকে বলে, "হে জ্যোতিষী ঠাকুর, আমি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ি, বহু ওষুধ খেয়েও কোনও লাভ হয়নি। আপনিই বলুন, কি করলে আমি সুস্থভাবে বাঁচতে পারব।" শশধরের কথা শুনে জ্যোতিষী বলেন, 'তোমার অষ্টধাতুর একটি ও প্রবালের একটি আংটি ধারণ করতে হবে। তা হলেই সুস্থ থাকতে পারবে।"

এরপর শশধর বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে আংটি দুটি সংগ্রহ করল। সে মনে করলো জ্যোতিষীর কথামতো সে সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে। আর অসুস্থ হবে না। তিনদিন পরে খেলার মাঠে অন্য ছেলেদের সঙ্গে শশধরের মারামারি হয়। সেই সময় আংটি দুটি সে হারিয়ে ফেলে। ছেলেরা কেউই আংটি নিয়েছে বলে স্বীকারও করল না। আংটি খুঁজে খুঁজে শশধর হয়রান হল। সেই দিনই সে সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভাস্কর শশধরকে দেখতে এল। অসুস্থ শশধরকে সে ফল খেতে দিল। তারপর বলল, "শশধর, সুস্থ থাকার উদ্দেশ্যে তুমি যে আংটিগুলি এনেছিলে, সেগুলো কোথায়?" শশধর বলল, 'চুরি হয়ে গেছে।" "তবে আবার তেমন আংটি নিয়ে এলেই তো হয়।" "পয়সা নেই।"-আমি দেব।" আবার তেমন আংটি আনা হল। কিন্তু অসুস্থতা তার লেগেই থাকল। তখন ভাস্কর বলল, "শশধর, হরিনাম কর। আমাদের কর্মফল যা ভোগ করার তা যখন ভোগ করতেই হচ্ছে, তখন আর নিস্তার লাভের উপায় কি?" শশধর বলল, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আংটি আবার চুরি হতে পারে, তাতে আরও অসুস্থতা বাড়বে। কিন্তু হরিনাম কেউ চুরি করতে পারে না।"

হিতোপদেশ

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাগত হয় তখন ভগবানও তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপের ভার তিনি লাঘব করেন।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের নামহট্ট বিভাগ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে
কিভাবে গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

স্বাভাবিক বৈরাগ্য

শ্রীল প্রভুপাদ কখনও কখনও বলেছেন যে গৃহস্থ দম্পতি বিশেষতঃ আশ্রমবাসী স্বামী এবং স্ত্রী যেন পৃথকভাবে বসবাস করে (প্রভুপাদ শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৬) আবার কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন (শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৭)। কখনো তিনি বিবাহে উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো কখনো একেবারেই উৎসাহ দিচ্ছেন না। এগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। দেশ কাল ও পাত্রের পার্থক্য অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। যার মনে স্ত্রীসঙ্গের বাসনা প্রবল, তার পক্ষে জোর করে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। আবার বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা অনেক গৃহস্থের ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সুতরাং কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে গিয়ে মনে মনে ভোগের চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে ভক্তির প্রতিকূল। সেই ধরনের কৃত্রিম বৈরাগ্য অবলম্বনকারীকে শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাচারী বা ভণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন। (গীতা ৩/৬)

ভক্তিযোগে কৃত্রিমভাবে কোনকিছুই অনুষ্ঠান করা হয় না। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই ভক্তিযোগের অনুশীলন করা যায়। স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরের প্রতি আসক্ত, তাঁরা একসঙ্গে থাকবেন বটে, তবে হরিনাম জপ তথা শ্রবণ কীর্তনরূপ নববিধা ভক্তি থেকে বিরত হওয়া চলবে না। প্রথম দিকে ভক্তের সঙ্গে মায়ার যুদ্ধ চলবে। অনেকের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ কিছুটা দীর্ঘকালীন বলেও মনে হতে পারে। একদিকে বিষয় চিন্তা এবং অপরদিকে হরিনাম এই যুদ্ধে মুহূর্তের জন্যও পিছপা হওয়া উচিত নয়-কেননা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে-অর্থাৎ যদিও মায়া খুব শক্তিশালী, যিনি হরিনাম জপকীর্তন, হরিকথা শ্রবণ কীর্তনরূপ যুদ্ধে কখনও পিছপা হন না, তিনি মায়াকে অতিক্রম করবেন। ক্রমে ক্রমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরকে ভুলে যাবেন। এটাই স্বাভাবিক বৈরাগ্য।

স্বামীর যোগ্যতা

সাধারণত নারীজাতির জড় কামনার কোন শেষ নেই। প্রচুর অর্থ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। নারীজাতির প্রধান তিনটি চাহিদা হলঃ

১। অপর্যাপ্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা ২। সুন্দর সুন্দর পোশাক এবং অলঙ্কারের চাহিদা ও ৩। যৌন তৃপ্তির চাহিদা। কোন পুরুষ যদি নারীর উপরোক্ত তিনটি চাহিদা মেটাতে না পারে, তা হলে সেই সংসারের সমস্যার শেষ নেই। কিন্তু সমস্যা হল, এই চাহিদাগুলি পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করা কখনোই সম্ভব হয় না। যখনই কোন পুরুষ তার স্ত্রীর এই সমস্ত চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েন, তখন কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যায়।

তা হলে এই সমস্যার সমাধান কি? এই সমস্যার সমাধান করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই তীব্রভাবে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করতে হবে। স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত রাখা। যদিও স্ত্রীজাতির ভোগবাসনা অনেক বেশি, তবুও তাঁদের একটা বিশেষ যোগ্যতা আছে যা পুরুষের ক্ষেত্রেও ততটুকু নেই। সেটা হল তাঁদের হৃদয়ের সরলতা। কোন নারী যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁর সরল ভক্তি বিশ্বাস পুরুষের থেকেও বেশি। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখা যায়, পুরুষদের থেকে নারীদের ধর্ম প্রবণতাই যেন অধিক প্রবল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের সমাগমই বেশি হয়ে থাকে।

একটা সরল শিশুকে যেমন কুপথে চালিত করা সহজ। নারীরাও অনেকটা শিশুর মতো। তাই স্বামীর কর্তব্য হল তাঁর স্ত্রীকে এমনভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত করা যাতে স্বতস্ফুর্তভাবেই স্ত্রী জড় চাহিদা কমে যায়। পাশাপাশি স্ত্রীর পর্যাপ্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকে অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু স্বামীর মূল দায়িত্ব হল স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত করা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৫/৫/১৮) বলা হয়েছে, যে পতি তার স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনা দানের মাধ্যমে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে না, সেই ব্যক্তি স্বামী হবার যোগ্য নয়।

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও জড় জগতে প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ প্রেম কথাটি ভগবৎ-সম্বন্ধীয়। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বলে প্রেম কোন জাগতিক বস্তু নয়। তা অপ্রাকৃত পারমার্থিক বস্তু। কোনও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধীয় কোন কথা কোথাও বলা হয়নি, যা কেবল তথাকথিত পণ্ডিতদের নোভেল-উপন্যাস, পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। জড়-জাগতিক সম্বন্ধগুলি প্রেমের সম্বন্ধ নয়। জড়-জাগতিক সম্বন্ধগুলি সমস্তই স্বার্থপরতা, মায়া-মোহ-মমতা ও কাম-পরায়ণতার ব্যাপার। তা প্রেম নয়, কাম। কাম জড়-জাগতিক। প্রেম পারমার্থিক। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্মল ভাস্কর। কাম কলুষ, প্রেম পবিত্র। কাম পচনশীল দেহের ভিত্তিতে গঠিত, প্রেম অবিনশ্বর, আত্মা ও পরমাত্মা পরমেশ্বরের দিব্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত। শুদ্ধ ভক্তের মুখে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে শ্রবণ করলে জীবের হৃদয়ে কাম-কুলুষতা দূরীভূত হয়। জড়-জাগতিক কামনা-বাসনাই ভগবদ্ভক্তি থেকে মানুষকে বিমুখ করে।

প্রশ্ন ২। পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টিকর্তা কে?

প্রশ্নকর্তাঃ রমেন চন্দ্র সিনহা জগতাগাঁও, দিনাজপুর।

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর অর্থাৎ পরম ঈশ্বর। তাই পরম ঈশ্বরের আবার সৃষ্টিকর্তা রয়েছে-এরূপ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। যিনি পরম, তাঁর উপর কেউই থাকেন না। যদি থাকেন, তবে 'পরমেশ্বর' কথাটি ব্যবহার করা হত না। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'অসমোর্ধ্ব' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অসমোর্ধ্ব কথাটির অর্থ হল 'যাঁর সমান কেউ নেই, এবং যাঁর উর্ধ্বে কেউ নেই। তিনিই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনার আমার সৃষ্টিকর্তা রয়েছে বলেই তো আমরা ভগবান নই। যে কারণে আমরা ভগবান নই সেই কারণটি ভগবানের ক্ষেত্রে আরোপ কর কেন? সৃষ্টির আদি জীব প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করছেন-

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অর্থাৎ, "সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অনাদিরও আদি এবং সমস্ত কারণের পরম কারণ।" (শ্রীব্রহ্মসংহিতা১) এই থেকে প্রতিপন্ন হয় যে পরমেশ্বরের কোন কারণ নেই। পরমেশ্বরের কোন আদি নেই। তিনিই সমস্ত কারণের পরম কারণ।

প্রশ্ন ৩। 'অষ্টসাত্ত্বিক বিকার' কথাটির অর্থ কি?

প্রশ্নকর্তাঃ ডা:সুখেন্দ্র সরকার, বক্সনগর,নবাবগঞ্জ, ঢাকা

উত্তর ঃ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা দিব্য আনন্দের প্রভাবে মানসিক অবস্থার রূপান্তর হয়। যখন কেউ ভগবৎ-প্রেমে অত্যন্ত আপ্লুত হন, তখন তাঁর শরীরে স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, আনন্দজনিত ক্রন্দন এবং সমাধি এই আটটি দিব্য আনন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই অবস্থাকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা হয়। রজ, তম কিংবা সত্ত্বগুণে প্রভাবিত কলুষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ অবস্থা কখনই দৃষ্ট হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরে উপনীত হয়েছেন এমন অত্যন্ত ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তির শরীরে কখনও এইরূপ অষ্টসাত্ত্বিক ভাব দেখা যায়। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তগণ সেই ভাব উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান কলিযুগের কলুষিত ব্যক্তিরা ভক্তির নামে ভণ্ডামি করে জনগণের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের আশায় কৃত্রিমভাবে অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার দেখাতে চেষ্টা করে। পরিণামে তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হেয় হয়ে পড়ে। শাস্ত্রে সেই প্রমাণও রয়েছে। সেই ভণ্ডদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে।

প্রশ্ন ৪। ক্রোধভাবাপন্ন হয়ে কি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা যায়?

প্রশ্নকর্তাঃ মাধব সরকার, পূর্ব রাজা বাজার, ঢাকা।

উত্তর ঃ সাধারণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণভক্ত অক্রোধ। তাঁর মধ্যে ক্রোধের উত্তেজনা থাকে না। ক্রোধের বশে ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই ক্রোধও ভগবৎ-সেবার অনুকূল কার্য করতে পারে। যেমন, সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজের কাছ থেকে মুক্ত করে ।

আনবার জন্য হনুমান লংকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু বহু রাক্ষস হনুমানের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে শুরু করে। তাঁর হাত পা মন্ত্রপূত রজ্জুতে বেঁধে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে থাকে। তারপর একটা কাপড়ে তেল লাগিয়ে কাপড়টা হনুমানের লেজে জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন হনমান অগত্যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ নিয়ে সমগ্র লংকা পুরী ক্রোধের সঙ্গে লেজের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করতে শুরু করেন। হনুমানজীর এরূপ ক্রোধ ভগবদ্ভক্তির অনুকুল। এ ছাড়া, কোন ভক্ত বা ভগবানের অবমাননা করা হলে সেই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয়। পরম বৈষ্ণব শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন-'কাম' কৃষ্ণ-কর্মাপণে, 'ক্রোধ' ভক্ত দ্বেষী-জনে, 'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা। (ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন) অর্থাৎ, আমাদের উচিত কামনা-বাসনাকে কৃষ্ণকর্মে অর্পন করা, ক্রোধকে ভক্ত-বিদ্বেষীদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করা এবং লোভ থাকা উচিত সাধুসঙ্গে হরিকথার প্রতি।

প্রশ্ন ৫। জীবের ইচ্ছাশক্তি কি? এই ইচ্ছাশক্তির অন্তরালে কি প্রভু কৃষ্ণের কোনও প্রভাব আছে।?

প্রশ্নকর্তাঃ নারায়ণ দাস, বরুড়া, শুদ্রা, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ জীবকে ভগবানের দেওয়া স্বাতন্ত্র্য বোধই জীবের ইচ্ছাশক্তি। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হচ্ছে, সকলে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে সচ্চিদানন্দময় দিব্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করুক। কিন্তু তিনি যে, জীবকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা দান করেছেন, সাধারণ ক্ষেত্রের উপর বাধ্যতা প্রদর্শন করেন না। কারণ জীব ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারে, না-ও বাসতে পারে। জোর করে বলপ্রয়োগ করে ভালবাসা হয় না। তাই প্রেমস্বভাব শ্রীকৃষ্ণও সরাসরি কাউকে বাধ্য করেন না। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীন নন, মায়া তাঁর অধীন। তাই তিনি সর্বদা আনন্দময় ও আত্মারাম। তিনি নির্বিকার থাকেন। কিন্তু মায়াধীন জীব বিকারগ্রস্ত হয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করে। মায়া বদ্ধ জীব তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিতে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে ভবযন্ত্রনা ভোগ করে।

কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিপরীত যে করে বাসনা
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা॥
কৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা করে তাহা জেনো ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।।

প্রশ্ন ৬। সাধারণত বলা হয় ছোট শিশু নিস্পাপ। কিন্তু আমার মনে হয় নিস্পাপ হলে ধরা ধামে না এসে গোলোকে বৃন্দাবনে সে চলে যেত। পাপীরাই এই জগতে আসে। কোনটি ঠিক?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী সুরেশ রাজবংশী, শুরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর ঃ মহাভারতের শান্তিরপূর্বে ৩২৩ অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীভীষ্মদেব বলছেন, "মানুষ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখ-দুঃখ পেয়ে থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, লোক যে অবস্থায় যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তার অনুরূপ ফল ভোগ করতেই হয়।" অর্থাৎ ছোট শিশু মাত্রই নিস্পাপ-এটি ঠিক কথা নয়। কারণ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে তাকে এই জন্ম-মৃত্যুর ভবসংসারে জন্ম লাভ করতে হয়েছে। আবার অনধিক একশ বছরের মধ্যে যেকোন মুহূর্তেই তাকে দেহত্যাগ করতেই হবে। পুনরায় নতুন কোনও দেহ ধারণ করতেই হবে। তবে, যদি কেউ ছোটবেলা থেকেই হরিভজন শুরু করে দেয় তবে তার প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রারব্ধ পাপের ফলভোগ থেকে রক্ষা পায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তার শরণাগত ব্যক্তিকে তিনি সর্ব পাপ থেকে রক্ষা করেন। সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি (গীতা ১৮/৬৫)। পাপী মানুষেরাই এই ধরাধামে আসে-এই কথাটিও ঠিক নয়। কারণ যারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হয়ে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত জীবনযাপন করছেন তাঁরা অবশ্যই সর্বদেবতারও বন্দনীয়। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, স্বর্গের দেবতাগণ সংকীর্তন আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে মানবকুলে জন্মগ্রহনের বাসনা করে থাকেন। অতএব পাপীরাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করে এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৭। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা বলে যে, মদের দোকান কর, কিন্তু মদ খেও না। এটা কি যুক্তিযুক্ত কথা?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী বিধান দাস, আজিমপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ কলির চতুর্বিধ পাপ কর্মের মধ্যে মদ্যপান বা নেশাভাঙ করা হল একটি পাপ কর্ম। মদের ব্যবসা দোকান খোলা রয়েছে বলেই মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব মদের ব্যবসা করে লোককে মদ খাওয়ানোটাও একটি বড় পাপ। কেবল মদ পানকারীই

আনবার জন্য হনুমান লংকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু বহু রাক্ষস হনুমানের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে শুরু করে। তাঁর হাত পা মন্ত্রপূত রজ্জুতে বেঁধে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে থাকে। তারপর একটা কাপড়ে তেল লাগিয়ে কাপড়টা হনুমানের লেজে জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন হনমান অগত্যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ নিয়ে সমগ্র লংকা পুরী ক্রোধের সঙ্গে লেজের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করতে শুরু করেন। হনুমানজীর এরূপ ক্রোধ ভগবদ্ভক্তির অনুকূল। এ ছাড়া, কোন ভক্ত বা ভগবানের অবমাননা করা হলে সেই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয়। পরম বৈষ্ণব শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন-''কাম' কৃষ্ণ-কর্মাপণে, 'ক্রোধ' ভক্ত দ্বেষী-জনে, 'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা। (ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন) অর্থাৎ, আমাদের উচিত কামনা-বাসনাকে কৃষ্ণকর্মে অর্পন করা, ক্রোধকে ভক্ত-বিদ্বেষীদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করা এবং লোভ থাকা উচিত সাধুসঙ্গে হরিকথার প্রতি।

প্রশ্ন ৫। জীবের ইচ্ছাশক্তি কি? এই ইচ্ছাশক্তির অন্তরালে কি প্রভু কৃষ্ণের কোনও প্রভাব আছে।?

প্রশ্নকর্তাঃ নারায়ণ দাস, বরুড়া, শুদ্রা, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ জীবকে ভগবানের দেওয়া স্বাতন্ত্র্য বোধই জীবের ইচ্ছাশক্তি। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হচ্ছে, সকলে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে সচ্চিদানন্দময় দিব্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করুক। কিন্তু তিনি যে, জীবকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা দান করেছেন, সাধারণ ক্ষেত্রের উপর বাধ্যতা প্রদর্শন করেন না। কারণ জীব ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারে, না-ও বাসতে পারে। জোর করে বলপ্রয়োগ করে ভালবাসা হয় না। তাই প্রেমস্বভাব শ্রীকৃষ্ণও সরাসরি কাউকে বাধ্য করেন না। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীন নন, মায়া তাঁর অধীন। তাই তিনি সর্বদা আনন্দময় ও আত্মারাম। তিনি নির্বিকার থাকেন। কিন্তু মায়াধীন জীব বিকারগ্রস্ত হয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করে। মায়া বদ্ধ জীব তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিতে কৃষ্ণ বর্হিমুখ হয়ে ভবযন্ত্রনা ভোগ করে।

কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিপরীত যে করে বাসনা
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা॥
কৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা করে তাহা জেনো ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।।

প্রশ্ন ৬। সাধারণত বলা হয় ছোট শিশু নিস্পাপ। কিন্তু আমার মনে হয় নিস্পাপ হলে ধরা ধামে না এসে গোলোকে বৃন্দাবনে সে চলে যেত। পাপীরাই এই জগতে আসে। কোনটি ঠিক?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী সুরেশ রাজবংশী,শুরগঞ্জ,নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর ঃ মহাভারতের শান্তিরপূর্বে ৩২৩ অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্রীভীষ্মদেব বলছেন, "মানুষ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখ-দুঃখ পেয়ে থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, লোক যে অবস্থায় যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাকে পরজন্মে সেই অবস্থায় তার অনুরূপ ফল ভোগ করতেই হয়।" অর্থাৎ ছোট শিশু মাত্রই নিস্পাপ-এটি ঠিক কথা নয়। কারণ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে তাকে এই জন্ম-মৃত্যুর ভবসংসারে জন্ম লাভ করতে হয়েছে। আবার অনধিক একশ বছরের মধ্যে যেকোন মুহূর্তেই তাকে দেহত্যাগ করতেই হবে। পুনরায় নতুন কোনও দেহ ধারণ করতেই হবে। তবে, যদি কেউ ছোটবেলা থেকেই হরিভজন শুরু করে দেয় তবে তার প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রারব্ধ পাপের ফলভোগ থেকে রক্ষা পায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তার শরণাগত ব্যক্তিকে তিনি সর্ব পাপ থেকে রক্ষা করেন। সর্বপাপেভো মোক্ষয়িষ্যামি (গীতা ১৬/৬৫)। পাপী মানুষেরাই এই ধরাধামে আসে-এই কথাটিও ঠিক নয়। কারণ যারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হয়ে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত জীবনযাপন করছেন তাঁরা অবশ্যই সর্বদেবতারও বন্দনীয়। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, স্বর্গের দেবতাগণ সংকীর্তন আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে মানবকুলে জন্মগ্রহনের বাসনা করে থাকেন। অতএব পাপীরাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করে এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৭। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা বলে যে, মদের দোকান কর, কিন্তু মদ খেও না। এটা কি যুক্তিযুক্ত কথা?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রী বিধান দাস, আজিমপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ কলির চতুর্বিধ পাপ কর্মের মধ্যে মদ্যপান বা নেশাভাঙ করা হল একটি পাপ কর্ম। মদের ব্যবসা দোকান খোলা রয়েছে বলেই মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব মদের ব্যবসা করে লোককে মদ খাওয়ানোটাও একটি বড় পাপ। কেবল মদ পানকারীই

পাপের ভাগী হবে, মদ কারবারী পাপচারী হলো না- এরূপ নয়। মদের দোকান করার অর্থই অপরকে নেশাভাঙ করতে সুযোগ দেওয়া, দোকানদার চায় অপরে নেশা করে জীবন নস্যাৎ করুক। অতএব যারা মদের দোকান করছে তারা অবশ্যই অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করছে। সহজিয়াদের মনগড়া সব কথা সর্বদাই বর্জনীয়।

প্রশ্ন ৮। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব কুটুম্বদের যাতায়াত হয়। তাদের সঙ্গে সৌজন্য রক্ষার্থে আমাদের বয়স্ক আত্মীয়দের দ্বারা বাধ্য হয়ে আমাদের চা পান বিড়ি দিতে হবে। যেটি আমরা একদমই পছন্দ করি না। অথচ এমতাবস্থায় কি করা প্রয়োজন?

প্রশ্নকর্তাঃ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস, শেরপুর।

উত্তর ঃ চা পান বিড়ির মাধ্যমে সৌজন্য রক্ষা হয়–এটি গ্রাম্য বিশ্রীকর ব্যবস্থা। যদি সৌজন্য রক্ষা করতেই হয়, তবে চা এর বদলে আয়ুর্বেদিক চা, পানের বদলে পানমৌরি, বিড়ির বদলে বহেড়া দিলে ঠিক উপযুক্ত হবে। এ সব জিনিস চা, পানসুপারি ও বিড়ির মতো ক্ষতিকর নয়। সবচেয়ে ভালপন্থা হল শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ নিবেদন করা।

প্রশ্ন ৯। স্মরণ কি?

প্রশ্নকর্তাঃ করুণাসিন্ধু দাস, নীলফামারী।

উত্তর ঃ যে কোনও ভাবে কেউ যদি চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের চিন্তায় নিবদ্ধ করেন, তাকে বলা হয় স্মরণ। পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার ফলে জীবের সর্ব-অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। "জীবিত অবস্থায় কিংবা মৃত্যুক্ষণে কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তবে তিনি সমস্ত রকমের পাপ থেকে মুক্ত হন।" (পদ্মপুরাণ) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের চিন্তাটাই স্মরণ। স্মরণই মনের প্রাণ বা জীবনীশক্তি। স্মরণহীন মন হচ্ছে জীবনশূন্য শব বা মড়ার মতোই। যে দেহে প্রাণ থাকে না, শকুন শেয়াল কুকুরেরা সেই দেহকে ভক্ষণ করতেই সচেষ্ট থাকে, সেইরকমই স্মরণহীন মনকে কাম-ক্রোধ-লোভ রিপুগুলি সর্বদা দংশন করতে লেগে পড়ে। দেহে জীবন থাকলে শেয়াল কুকুরেরা পালিয়ে যায়, তাকে ভক্ষণ করতে আসে না, অনুরূপভাবে কৃষ্ণস্মরণরূপ প্রাণবন্ত মনকে দেখলে কাম ক্রোধ রিপুরা দূরে পালিয়ে যায়। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ চার প্রকারের স্মরণের কথা বলেছেন- নামস্মরণ রূপস্মরণ, গুণস্মরণ ও লীলাস্মরণ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছাতি। (ভাঃ ১০/৮০/১১) "শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তির কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন।

প্রশ্ন ১০। অক্ষয় তৃতীয়া কি? চন্দন যাত্রা কি? এই উৎসবের তাৎপর্য কি?

প্রশ্নকর্তাঃ শ্রীমতি সাথি হালদার, খুলনা।

উত্তর ঃ মৎস্য পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, "ভগবান শ্রীহরি বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে যবের সৃষ্টি করেন এবং সত্য যুগের বিধান করেন। এই দিনে ভগবান পবিত্র-সলিলা সুরধুনী গঙ্গাকে ব্রহ্মলোক থেকে এই ধরাধামে অবতরণ করিয়েছিলেন।" এই তিথি অক্ষয় তৃতীয়া নামে আখ্যাত। আরও বলা হয়েছে "এই তিথিতে যব-হোম ও যব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে ঐ দিনে যব পূর্বক ভোজন করাতে হয়।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, বৃন্দাবনে পরম বৈষ্ণব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে স্বপ্নে তাঁর আরাধ্য শ্রীগোপাল বলছেন, "আমার শরীরের তাপ জুড়াচ্ছে না। মলয় প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে এসে এবং তা ঘষে আমার অঙ্গে লেপন কর, তা হলে তাপ জুড়াবে।" তারপর পূর্বভারতে বৃদ্ধ মাধবেন্দ্র পুরী নীলাচলে জগন্নাথ পুরীতে এসে সেবকদের কাছে মলয় চন্দন ও কর্পূর নিয়ে বৃন্দাবনে ফিরছিলেন। পথে রেমুণাতে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে আসেন। সেই রাত্রে সেখানে শয়নকালে স্বপ্ন দেখেন, গোপাল এসে বলছেন, "হে মাধবেন্দ্রপুরী, আমি ইতিমধ্যেই সমস্ত চন্দন ও কর্পূর গ্রহণ করেছি। এখন কর্পূর সহ ঐ চন্দন ঘষে ঘষে শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর। গোপীনাথ ও আমি অভিন্ন। গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগালেই আমার অঙ্গ শীতল হবে।" সেদিন থেকে চন্দন যাত্রা উৎসব শুরু হল। গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্রীহরির অঙ্গে কর্পূর চন্দন লেপন করলে ভগবান শ্রীহরি প্রীতি হন।

-শ্রী সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে সকলেই পশুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা। তার ফলে আপনা থেকেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে। তার ফলে তখন আমরা যথাযথই সুখী হতে পারব। তখন আমরা ভগবৎ প্রেম অনুভব করতে পারব, জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য খুঁজে পাব। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করার কি প্রয়োজন? ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যদি আমরা না করি, তা হলে ক্ষতি কি? ক্ষতিটা হচ্ছে এই যে, তখন বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি দেখা দেবে। আমরা শান্তি এবং সমৃদ্ধির চেষ্টা করে চলেছি। এই শান্তির ভিত্তি কি? শান্তির ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। কেউ কি কাউকে ভাল না বেসে শান্তি পেতে পারে ? না। তা কি করে সম্ভব? কিন্তু মানুষ যখন ভগবানকে ভালবাসে, তখন সে সকলকেই ভালবাসে এবং সে যদি ভগবানকে ভাল না বাসে, তা হলে সে কাউকেই ভালবাসতে পারে না। কেননা ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু।

যেমন, কোন পরিবারের একটি মেয়ে। তার যখন বিবাহ হয়, তখন সে তার পতির পরিবারভুক্ত হয়। পতি-পত্নির সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে মেয়েটি তার পতির ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, সে তার পতির মা- বাবার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তার সম্পর্কিত হয়, পরিবারের সকলের সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর সেই সমস্ত সম্পর্কগুলি তা পতিকে কেন্দ্র করেই। পূর্বে সেই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে সেই ছেলেটির মা, বাবা, ভাই, বোন এবং অন্যান্য সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সেই মেয়েটির কোনই সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং সেই কেন্দ্রবিন্দু থাকতেই হবে

আপনি যদি ভগবানকে ভালবাসতে পারেন, তা হলে ভগবানের সম্পর্কে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবকেই আপনি ভালবাসতে পারবেন। আপনি আপনার সমাজকে ভালবাসতে পারবেন। আপনি আপনার দেশকে ভালবাসতে পারেন। আপনি আপনার বন্ধুকে ভালবাসতে পারবেন- সকলকে। সেটিই হচ্ছে আসল কথা। মানুষ কিন্তু অন্যভাবে ভাবছে "আমি কেন শুধু ভগবানকে ভালবাসব? 'ভগবানকে ভালবেসে লাভ কি? আমি ভালবাসব আমার পরিবারকে। আমি ভালবাসব আমার দেশকে । আমি ভালবাসব আমার -------"

কিন্তু না, এগুলিকে আপনি ভালবাসতে পারেন না। তা সম্ভব নয়, কেননা আপনি কেন্দ্রবিন্দুটি হারিয়ে ফেলেছেন। সেটিই হচ্ছে আসল কথা। 'হরাব- ভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা'- জড়জাগতিক দিক দিয়ে বা শিক্ষাগতভাবে মানুষ যতই গুণসম্পন্ন হোক না কেন সে যদি ভগবদ্ভক্ত না হয়, তা হলে তার কোন সদ্‌গুণই থাকতে পারে না। কেন? কেননা মনোরথে চড়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা করতে করতে সে জড়া প্রকৃতির কবলগ্রস্ত হয়ে অধঃপতিত হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যেঃ 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা'-মানুষ যখন ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হয়, তখন তার মধ্যে সমস্ত সদগুণগুলি আপনা থেকেই বিকশিত হয়।

এখন কথা হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির অর্থ কি? তা কি এক রকমের আবেগ বা গোঁড়ামি? না, এটি একটি বিজ্ঞান। কেউ যদি সেই নিয়ম কানুনগুলি মেনে চলে, তা হলে আপনা থেকেই তার মধ্যে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হবে। এটি আপনারা নিজেরাই দেখতে পারেন এবং যখন এই সমস্ত গুণগুলির প্রকাশ হয়, তখনই কেবল আপনি যথার্থ দেশপ্রেমিক হতে পারেন, যথার্থ জনসেবক হতে পারেন, তখন আপনি সকলেরই বন্ধু হতে পারেন, ভগবৎ প্রেমিক হতে পারেন- সব কিছু। সুতরাং সকলেই যদি এরকম হয় তা হলে সে অবস্থাটি কত সুন্দর হবে তা আপনারা সকলেই অনুমান করতে পারেন।

অবশ্য সকলেই যে এরকম হবে তা আশা করা যায় না। কিন্তু তবুও যদি সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা দশজন লোকও কৃষ্ণভক্ত হয় তা হলে সারা বিশ্বে শান্তি আসবে। কেন? কেননা 'একশ্চন্দ্র'– আকাশে অনেকগুলি তারার দরকার হয় না। অন্ধকার দূর করার জন্য একটি চাঁদই যথেষ্ট-'বরমেক গুণী হত্রো নির্গুণেন শতেন কিম্'। চাণক্য পন্ডিত বলেছেন যে, শত শত নির্গুণ থাকার চাইতে একজন গুণী পুত্র থাকা শ্রেয়। আধুনিক সভ্যতা সেই পথেই চলেছে- ভগবদ্বিমুখ সভ্যতা। কিন্তু যদি সভ্য সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় হয়, কৃষ্ণভক্ত হয়, তা হলে সারা বিশ্বে শান্তি আসবে। তা না হলে তা সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু

গতকাল একটি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভগবান কে?' তার হাবভাব এবং পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল যে সে শিক্ষিত। এখন এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছেঃ নরাধম হওয়ার শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে নরশ্রেষ্ঠে পরিণত করা, কিন্তু আধুনিক শিক্ষা মানুষকে নরাধমে পরিণত করছে। আর কোন শিক্ষার্থীকে যদি নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় , তা হলে তার অভিভাবকেরা ক্রুদ্ধ হন- "ও স্বামীজী , আমার ছেলেকে নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে! স্বামীজীর শিক্ষা অত্যন্ত বিপজ্জনক!"

এরকমই হচ্ছে। সদ্গুরু শিক্ষা দিচ্ছেন, "সিগারেট খেওনা, নেশা কর না, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ কর না, নির্ভীক হও, ভগবানের ভক্ত হও।" আর তার ফলে স্বামীজীটি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু কেউ যদি শিক্ষা দেয়, "নেশা কর, L S D খাও, উন্মাদ হও এবং পাগলা-গারদে যাও", তা হলে সে খুব জনপ্রিয় হবে। এখন কি করা যাবে? অবস্থাটাই এরকম। আমরা নরাধমদের সমাজে এসে পড়েছি- এটিই সব সময় মনে রাখতে হবে।

আমি কেবল আমেরিকার কথাই বলছি না, সমস্ত জগতের কথাই বলছি। এমন কি ভারতবর্ষেও সেখানকার সংস্কৃতি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল, সেখানেও সমস্ত মূর্খ নেতাগুলি শিক্ষা দিচ্ছে যে, জড় জগতটাকে ভোগ করাই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। এটি হচ্ছে এই যুগের প্রভাব। আপনারা মনে করবেন না যে, আমি কোন বিশেষ দেশ বা সমাজের সমালোচনা করছি। এটি হচ্ছে কলিযুগ-প্রতারণা আর প্রবঞ্চনার যুগ। জগৎজুড়ে তাই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা আর ভণ্ডামি চলছে। তাই আমাদের খুব সাবধান হতে হবে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। '

মায়া বা জড়া প্রকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালিনী। আমরা যদি একটু অসাবধান হই, একটু শিথিল হয়ে পড়ি, তা হলে যে কোন মুহূর্তে আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের কথা ভুলে যেতে পারি। সর্ব কারণের পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু কোন কারণবশত, আমরা তা ভুলে গেছি। তাই এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ- শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, "তোমার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক নিত্য সনাতন।" আমরা বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করেছিঃ তাই আমরা দুঃখ ভোগ করছি। ভগবান কে? 'বিপর্যয়ো স্মৃতিঃ" আমাদের স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়েছে, তাই আমরা দুঃখ ভোগ করছি। কিন্তু মানুষ তা স্বীকার করতে চায় না। " "না, আমরা একটা বন্দোবস্ত করে নেব। আমরা নতুন আইন বানাব। আমরা উচ্চশিক্ষা দান করব। আমরা বড় বড় রাজনৈতিক দল বানাব। আমরা ভগবানকে অমান্য করব এবং এইভাবে আমরা সুখী হব।" এই ভগবদ্বিমুখ সভ্যতার ফলেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হয়েছে এবং তার ফলে এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কখনই বিপদগ্রস্ত হবেন না, তা সুনিশ্চিত। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ' ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে, তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের 'মহাত্মা' হতে হবে। সেই আত্মনিবেদনের পন্থাই হচ্ছে ভক্তি। এতকাল ধরে আমরা ভগবানের অবাধ্যতা করে এসেছি। এখন আমাদের ভগবানের বাধ্য হতে হবে। সেটিই সব। যখন এই তথাকথিত সভ্য জগতের মানুষেরা ভগবানের বাধ্য হতে হবে, তখনই সমাজে শৃঙ্খলা দেখা দেবে, শান্তির উদয় হবে। এখন কোন শৃঙ্খলা নেই। কেউই পারমার্থিক কল্যাণকর শাস্ত্রের অনুশাসন মানতে চায় না। সকলেই ভগবান হয়ে গেছে। আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তার অর্থ

বাকী অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শ্রীকৃষ্ণের নাম -রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ আদির গ্রাহ্য নয়। জীব যখন সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ
চিৎ-স্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনাম আদি স্বয়ংই হৃদয়ে স্ফুর্তি লাভ করে।
-(পদ্মপুরাণ, ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২৩৪)